মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী !

—রবীন্দ্রনাথ

Madhyadiner Gan

A Novel by : Sachindranath Bandopadhaya

Price Rs. 3·00.

মধ্য দিনের গান

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাইমা পাবলিকেশনস
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা, ১৩৬৮

প্রকাশক,
নারায়ণ সেনগুপ্ত,
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ রূপায়ণ
গণেশ বসু

মুদ্রাকর,
ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার,
শ্রীগোপাল প্রেস,
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

দাম তিন টাকা।

সহধর্মিনী

শ্রীমতী উমা দেবী

কল্যানীয়াসু

এই লেখকের :—

দেবকন্যা, জনপদবধূ, জলকন্যার মন, সিন্দুর টিপ, নীলাঞ্জন ছায়া, নীল সিন্ধু, তীরভূমি, বিদিশার নিশা, নতুন নাম নতুন ঘর, কতো আলোর সঙ্গ, এক আশ্চর্য মেয়ে, সীমাস্বর্গ, শ্বেতকপোত, এই তীর্থ, এ জন্মের ইতিহাস।

ঘটনার ভূমি যা-ই থাক, ভূমিকা অবশ্য এমন কিছু অসামান্য নয়। ইতিহাসের এম-এ আজ দেড়শো টাকার কেরাণী। ঐতিহাসিক আজ কারখানার ধ্বনির সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছেন জীবনটাকে। তাকের ওপর বোঝাই-করা ধূলো-পড়া পোকায় কাটা বইগুলির ওপর মাঝে মাঝে চোখ পড়ে। কতগুলি অর্থহীন কঙ্কালের মতো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা,—যাত্বঘরে রেখে দেওয়া প্রাগৈতিহাসিক কোনো নিদর্শনের মতো!

বাড়ি আর অফিস, অফিস আর বাড়ি। সুব্রতবাবু সাধারণতঃ কোথাও বেড়াতে যান না। এ যায়গাটা নাকি বেড়াবার পক্ষে চমৎকার, নতুন যাঁরা আসেন তাঁদের কাছ থেকে বহুবার শোনা গেছে এ রকম অভিমত। নতুন এসে এককালে সুব্রতবাবুও হয়ত ঐরকম কোন মতই প্রকাশ করে থাকবেন, কিন্তু এখন তার কোনো সাড়াই নেই। রবিবারের হাটে যেতে দূরের শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় চোখে পড়ে, কিন্তু অবসন্ন মন নিয়ে সুব্রতবাবু নির্বিকার।

—ওগো শুনছ?

শোনবার আশায় গৃহিণীর দিকে মুখ তোলেন সুব্রতবাবু, উচ্চারণ করেন,—বলো।

—বলব আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই থেকে চুপচাপ বসে আছো, একটা কিছু বিহিত করো?

—একেবারে এখ্খুনি! অফিস থেকে এলুম, একটু জিরুতে দাও।

—তা জিরোও না, যত খুশী জিরোও, আমারই হয়েছে যত মরণ, ছেলেপুলেদের দেখোরে, শোনোরে, বকোরে,—সব করার বেলাতেই আমি,—ছেলেমেয়েগুলো যেন আমারই একার! আমিও দিতে পারি ওরকম আল্গা।

—একটু বোসো, যাচ্ছি আমি, খানিক বিশ্রাম নিতে দাও।

—ওরে আমার বিশ্রাম রে! যাবেন ত সাততাড়াতাড়ি গুপ্তবাবুর বাড়িতে দাবা খেলতে, ফিরবেন সেই রাত্তির দশটার আগে নয়,—কীর্তি ত আর আমার জানতে বাকি নেই কিছু—খালি আড্ডা—আড্ডা! বাপই এইরকম, তা ছেলেগুলো আর হবে না-ই বা কেন!

কথাটা অবশ্য খুব যে অতিরঞ্জিত, তা নয়। গুপ্তবাবুর বাড়িতে দীর্ঘ সময় দাবা খেলায় ডুবে থাকা, এটা সুব্রতবাবুর একরকম অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে আজকাল।

—মতলবটা কী বলো দেখি? এরকম খোঁচা দিয়ে কথা বলার অর্থটা কী?

—ওরে বাপরে! বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কোর! ওঁর সঙ্গে আমি শুধু মতলবই করে বেড়াই—আমারই হয়েছে মরণ, সাতজন্ম পাপ করে ওঁর ঘরে এসে ঢুকেছি!

উঠে বসেন সুব্রতবাবু, বলেন,—ঘাট হয়েছে। এখন কী করতে হবে?

—সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কার পিসি! কাগজখানাতে কী ছাই লেখা আছে তা মাথায় ঢুকবে কি একটুও?

—কী কাগজ?

—ওমা, ভুলে গেলে!

—ও হ্যাঁ, তা, কী করতে হবে?

—মণ্টেটার কাণ ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইয়ে আনো, বুঝলে? কী ঘেন্নার কথা, সতেরো আঠারো বছরের পুঁচকে ছেলে, গুচ্ছের যাচ্ছে-তাই নভেল পড়ে পড়ে ডেঁপো হয়ে উঠেছেন! হবে না-ই বা কেন, শাসন আছে একটুও? বাপের শাসন না থাকলে কী ছেলেপিলে মানুষ হয়? বাপ ত এদিকে চোখ কাণ বুজে দাবার আড্ডায় মত্ত।

ব্যাপারটা এই। প্রতিবেশী হরি মুখুজ্যের চতুর্দশী কন্যা কণিকার উদ্দেশ্যে,—আর কিছুই নয়,—নিতান্তই দুর্বল আর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় লেখা একখানি পত্র,—গুরুগম্ভীর ভাষায় যাকে বলে,—প্রেমপত্র,—এবং সেটি লিখেছেন আর কেউ নয় শ্রীমান মণ্টু—পত্রখানি ওপক্ষের অভিভাবকদের কাছ থেকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এপক্ষের অভিভাবকদের কাছে।

সুব্রতবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—মণ্টেটা কোথায়?

—পোড়াকপাল আমার, সে খবরটাও রাখো না! সেই সাত সকালে আমার বকুনি খেয়ে বেরিয়েছে, বেলা গড়িয়ে গেল, এখনো ফেরবার নামটি নেই। তাইত বলছি, মুখ গুঁজে আড্ডায় পড়ে না থেকে দয়া করে একটু খুঁজে বার করে আনো হতভাগাটাকে।

—কোথায় আবার যাবে? হয়ত কোন বন্ধু-টন্ধুর বাড়ি গিয়ে বসে আছে।

—সে কি আর আমি খুঁজতে বাকি রেখেছি? এই বিনি কোথায় গেলি, বলনা তোর বাপকে, কুশীদের বাড়ি, কানাইদের বাড়ি সব যায়গায় ওরা খুঁজে এসেছে, কোথাও নেই।

—সে কী!

—আমারই হয়েছে মরণ! একটু বেরোও না, পা-খানাকে একটু চালিয়েই নিয়ে এসো না? লজ্জায় হতভাগাটা কী আর কারুর বাড়ি গিয়ে ঢুকবে? একটু নদীর ধারে টারে যাও,—ছেলের ত মাঝে মাঝে আবার ভাব ওঠে, চুপচাপ একা একা গিয়ে বসে থাকে নদীর ধারে কিম্বা জঙ্গলের মধ্যে। সাঁওতালদের ঐ গাঁ-টাও একবার দেখো, ওখানেও যায় কিন্তু মাঝে মাঝে।

আর একটি কথাও না বলে সুব্রতবাবু পথে এসে নামলেন।

কোয়ার্টারগুলোর রাস্তা ছাড়িয়েই এক ফালি সবুজ মাঠ, তারপরেই শালবীথির অরণ্য, তার মধ্যেই সাঁওতালদের গ্রাম। উঁচু নীচু অসমতল ভূমিতে বহুদিন পরে সুব্রতবাবুর পদপাত ঘটল।

এক ঝলক মৃদু আর ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগে। দূরে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের মাথার কাছে অপূর্ব বিভায় সূর্য রক্তিম হয়ে আছে, আর একটু পরেই অস্তমিত হবে। বাঁদিকে সুবর্ণরেখা, এখান থেকে নদীর ক্ষীণধারা চোখে পড়ে না। শুধু একটা দীর্ঘ আর গভীর খাদ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

শালবীথির অরণ্যে ঢাকা সাঁওতালদের গ্রাম। শালের বুকে নবপল্লব, শ্যাম সমারোহে যৌবনের অভিযান চলেছে।

একটি পায়ে-চলা পথকে অবলম্বন করলেন সুব্রতবাবু। ঝরা পাতা মর্মরিত হয়ে উঠলো।

সাঁওতালদের ঘরগুলো ছোট-খাটো, কিন্তু ভারী পরিষ্কার,—ঝকঝকে। কয়েকটা ঘর পার হয়ে একটা বাঁকে পড়তেই সুব্রত বাবুর ভালো লেগে গেল পরিবেশটা। একটু দাঁড়ালেন। ক্ষুদ্র গ্রামখানার একেবারে প্রান্তে এসে পড়েছেন তিনি। সামনে একটা সংকীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে নীচে নেমে গিয়ে আবার উঠে গেছে। সুব্রতবাবু আরও এগিয়ে গেলেন।

মণ্টেটাকে যে সাঁওতালদের গাঁয়ে এখন কিছুতেই পাওয়া যাবে না, এরকমই একটা ধারণা করেছিলেন তিনি। ভাবপ্রবণ ছেলে,—ওকে কী এখন পাওয়া যাবে ঐ বদ্ধ পরিসর ক্ষুদ্র সাঁওতালদে গাঁয়ে? হয়ত ছেলেটা বিকেলটা চুপচাপ কাটিয়ে দিচ্ছে নদীর গর্ভে কোনো পাথরের ওপর বসে, অথবা ক্ষুদ্র কোনো ঝর্ণার ধারে।

যেতে যেতে হঠাৎ এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন সুব্রতবাবু। কে একটি সাঁওতালী মেয়ে আসছে, খোঁপায় ফুল, কণ্ঠে গান।

মেয়েটি কাছে এসে পড়তেই এগিয়ে জিজ্ঞাসা করেন তাকে,-

—নদীর ধারটা কোনদিকে বলতে পারিস?

—হাই দিকে।

আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে মেয়েটি নিজের পথে চলে যায়।

সুব্রতবাবু এগিয়ে যান। দুইদিকে টিলা, মাঝখানে পায়ে

পথ এঁকে বেঁকে চলেছে। চমৎকার নির্জন আর নিস্তব্ধ জায়গাটা। সুব্রতবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন খানিকক্ষণ।

'তুমি আমার কল্পনা। যে প্রেরণা তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি, সারাজীবন তা আমার মস্ত সম্পদ হয়ে থাকবে! হে করুণাময়ী, তোমার কাছে আমি ঋণী রইলাম।'

অদ্ভুত ছেলে এই মণ্টু! কেমন করে যে ঐটুকু ছেলে এই চিঠি অমন গুছিয়ে লিখে উঠতে পারল,—সুব্রতবাবু ভেবে অবাক হয়ে যান।—প্রেরণা! কী এমন প্রেরণা পেলো সে হরি মুখুজ্যের ঐ এক ফোঁটা মেয়ের কাছ থেকে, যা সারাজীবন তার কাছে হয়ে থাকবে একটা মস্ত সম্পদ?

দূরে পাহাড়ের শ্রেণীর অন্তরালে সূর্য অস্তমিত হলো। কী অপূর্ব এই জনহীন অবকাশ,—মোহময় নিস্তব্ধতা!

কিছুটা অগ্রসর হতেই একটা বাঁক। বাঁকটা পেরিয়ে খানিকটা ঢালু জমি। জমির পরেই মসৃণ বালুর স্তূপ। আর তারপরেই,—এ-কী!

অপূর্ব রাজ্য! পাষাণ এখানে স্বপ্ন দেখছে! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্ন ছিন্ন পাষাণ-স্তূপ,—অসংখ্য নুড়ী, মাঝে মাঝে কোথাও এক টুকরো বালুর স্তর, কোথাও বা কাকচক্ষু টলটলে স্নিগ্ধ জল। কোনো কোনো প্রস্তরখণ্ড তরঙ্গাকৃতি,—ঢেউয়ের পর এসেছিল ঢেউ, তারই ইতিহাস যেন সযত্নে ধরে রেখেছে! কোনো কোনো মসৃণ প্রস্তরে অসংখ্য বাঁধ্য রেখা,—কী এক প্রাগৈতিহাসিক না-জানা ভাষার ঐশ্বর্য যেন! কোনো কোনো পাষাণ-স্তূপে পরিষ্কার পদচিহ্ন আঁকা, কে এক মহানুভব অতিথি এসেছিলেন একদিন,—তাঁরই পায়ের চিহ্নটুকু যেন নিদারুণ আগ্রহে ধরে রেখেছে! সবটা মিলিয়ে হয়ত কিছুই নয়,—কিন্তু কী এক পরম অর্থ নিয়ে চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে এরা!

সুব্রতবাবু এগিয়ে যেতে লাগলেন। আর তাঁর পায়ের কাছে নুড়ীগুলো নড়ে উঠল। ওরা মানুষের নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতির হাতে গড়া। তাই মানুষের কল্পনার সঙ্গে ওদের মিল নেই। কিন্তু তবু ওরা ঐতিহাসিক নিদর্শন। সে ইতিহাস মানুষের নয়, মানুষের কীর্তিকাহিনীর নয়, সে ইতিহাস প্রকৃতির। প্রকৃতির রাজ্যে কত কী বিবর্তন ঘটে গেছে, তার ইতিহাস কেউ লেখে না,—সেই না-লেখা ইতিহাসেরই হয়ত এক স্মরণীয় পৃষ্ঠা এই অপূর্ব রাজ্য!

সন্ধ্যা নামছিল। দু'একটা পখীর ডাক, আরও দূরে,—অস্পষ্ট কলগুঞ্জন। এখানে আরও কি কেউ এসেছে? একটা মসৃণ পাথর খণ্ড, তার ওপর উঠে বসলেন সুব্রতবাবু। নীচে স্বচ্ছ নীল স্বুবর্ণ-রেখার ধারা। অন্তর উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে। এখানে কি আগে কোনও দিন এসেছিলেন তিনি? মনে পড়ে না। কে জানে কি এ জায়গাটার নাম!

কলগুঞ্জন স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে হলো, সত্যিই কারা যেন এগিয়ে আসছে। পরক্ষণেই আবার মনে হলো, না, না, কেউ নয়! কিন্তু ও শব্দ তবে কিসের? হয়ত কোনো লুকানো ঝর্ণা, তারি কল্লোল আসছে ভেসে। যেন সঙ্গীত, যেন মন-প্রাণ আচ্ছন্ন করা কোনও সুর! ঘুম পাড়ানী গান শুনতে শুনতে শিশুরা যেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তেমনি ঐ সুর তার সমস্ত চেতনাকে ব্যাপ্ত করছে। আর সেই সুর-ব্যাপ্ত অন্তর দিয়ে সুব্রতবাবু প্রকৃতিকে অনুভব করতে লাগলেন। সম্মুখে অরণ্য, তারপরেই ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী সিদ্ধেশ্বর পাহাড়! স্বপ্নাচ্ছন্ন আকাশ আর বাতাস আর সেই সুর!

'রাত্রি এসে যেথায় মেশে···!'

একী, মানুষের কণ্ঠস্বর! সুব্রতবাবু একটু ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন, কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ আসছে এগিয়ে, তাদের মধ্যে একজন, খুব সম্ভবত মেয়ে, গাইতে গাইতে আসছে। তারই কণ্ঠ!

'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে,

তোমায় আমায় দেখা হলো সেই মোহানার ধারে।...'

অতি অদ্ভুত অতি চমৎকার লাগল এই গান। রাত্রি এসে দিনের পারাবারে যে মোহানায় মিশলো, সেখানে দেখা হলো কার সঙ্গে? কে সে?

—কে আপনি এখানে বসে? শুনছেন?

টর্চের ক্ষীণ আলো এসে পড়ল। সুব্রতবাবু চমকে উঠে বললেন—কে?

—কিছু মনে করবেন না। আমরা নতুন লোক। বেড়াতে এসে পথ ভুলে ঘুরে মরছি। কোনদিকে পথ বলতে পারেন?

—পথ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মৌভাণ্ডারের রাস্তা বলে দিলেই আমরা চিনে যেতে পারব বাসায়।

অতি অদ্ভুত লাগল। পথ খুঁজছে? তা-ও ওঁর কাছে! সুব্রতবাবু হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

—আচ্ছা দেখুন, নদীর ধার দিয়ে দিয়ে গেলে আমরা রাস্তায় উঠতে পারব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবেন বইকি।

—ধন্যবাদ।

আবার একটু পরে।

—শুনছেন?

—বলুন?

—কিছু মনে করবেন না, আপনি কি মৌভাণ্ডারেই থাকেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আপনি সুব্রত চৌধুরী নামে কাউকে চেনেন?

—সুব্রত চৌধুরী! কেন বলুন ত? কী দরকার! আমিই!

—বাই জোভ্! আপনি!

—হ্যাঁ।

সমগ্র দলটি ওঁর কাছে ঘন হয়ে এলো।

—ঘাটশীলায় নেমেই আমরা আপনার খোঁজ করেছি। আমরা হচ্ছি কলকাতার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী। ঘাটশীলায় এসেছিলাম বেড়াতে। প্রফেসর মজুমদারকে চেনেন ত? তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি আপনার নাম। প্রাচীন তক্ষশীলা এবং ভারতের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে আপনি গবেষণা করছিলেন। 'হারানোদিন' নামে আপনি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একখানা ইতিহাস-গ্রন্থও রচনা করছিলেন। তার প্রথম খণ্ড আমরা পড়েছি। কিন্তু এর পরের খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় নি কেন? এ এক অপূর্ব জিনিষ সৃষ্টি হচ্ছিল বাংলা দেশে!

অনেক কথাবার্তা বলে দলটি কখন যে বিদায় নিয়ে গেল, সুব্রতবাবু জানেন না। কী এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে সমস্ত চেতনা ছেয়ে গেছে। যখন চমক ভাঙল, তখন রাত কতো কে জানে! অন্ধকার অপসারিত করে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে।

ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করছিলেন! কিন্তু কীসের ইতিহাস?

'খ্রীষ্টীয় ৪৪ অব্দে পার্থিয়ানদের রাজত্ব চলেছে তক্ষশীলায়। তখন রাজা ছিলেন ফ্রাওটিস্। সেই সময় টায়ানার অ্যাপো-লোনিয়াস্ তক্ষশীলা পরিদর্শন করেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়'......

—ব্রতীদা ও ব্রতীদা? এই বিকেল বেলায় মুখ গুঁজে বসে লিখছ কী? চলো, চলো?

একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। পরণে ফিকে নীল রঙের একটা শাড়ী। সমস্ত মুখ উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় ভরে গেছে, দুই চোখে অপূর্ব জ্যোতি! তরুণ সুব্রত কলম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো —চলো।

—কোথায় যাবে ?

—নদীর ধারে।

ওরা বসেছিল স্রোতস্বতী নদীটির কিনার ঘেসে। সুব্রত বললে,—তোমাদের দেশ সত্যিই চমৎকার।

—আমাদের দেশ ? আর তোমার নয় বুঝি ?

—ঐ হলো। কতটুকু থাকতে পাই দেশে ? কলকাতা শহর আমাদের গ্রাস করছে।

—তোমার কলেজ খুলছে কবে ব্রতীদা ?

—শীগ্‌গিরই। আর দিন পনেরো পরেই দেশত্যাগী হচ্ছি।

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপরে সে বললে,—দেখ দেখি, আমার এমন শাড়ীটা চোরকাঁটায় ভরে গেছে। এখন ছাড়ায় কার সাধ্য ?

—আমাকে দিও। ছাড়িয়ে দেবো।

—দূর। তুমি কোথায় ঘুরবে তক্ষশীলার রাস্তায় রাস্তায়, তা নয় ছাড়াতে বসবে চোরকাঁটা! কী যে বলো ? সত্যি ব্রতীদা, তুমি কতো বড়ো, আর তুলনায় কতো ছোট আমি!

—কে বললে তুমি ছোট! যদি কোনদিন জীবনে বড়ো হয়ে ওঠা সম্ভব হয়, তা হলে তার গৌরব সম্পূর্ণ প্রাপ্য তোমার। যে প্রেরণা তোমার কাছ থেকে পাই, তার মূল্য কি কখনও নিরূপণ করা যাবে ?

একটা হাত তুলে নিয়েছিল হাতে, বলেছিল—তুমি বড়ো হবে, কেউ রোধ করতে পারবে না তোমার পথ। ব্রতীদা, তুমি যে সাধনা করছ! তুমি যে সাধক!·····

এর পরে কিছুকাল কেটে গেছে। কলকাতার ঘরে সারাদিনটা বই আর খাতার মধ্য দিয়ে তখন কাটছিল সুব্রতর। সপ্তম শতাব্দীর তক্ষশীলার যে বিবরণ দিয়ে গেছেন হুয়েন স্যাঙ,—ওর মন তারই মধ্য দিয়ে তখন পথ হাঁটছিল। এমন সময় এলো চিঠি। প্রজাপতির ছাপ বসানো রঙীন একটি পত্র, আর কিছু নয়।

তারপর চলে গেছে বহু মাস, বহু বৎসর। এগিয়ে চলেছে সময়ের স্রোত। এক তীর ভাঙে, এক তীর গড়ে,—ভাঙা গড়ার খেলা চলছে অবিরাম।

সুব্রতবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কোথায় রাজা আম্ভী, রাজা পৌরভ? কোথায় ইউমেনিস্, ম্যাপোলোডোটাস্, অ্যান্টিয়াল-সিডাস্, কাজুলা, কণিষ্কর দল!···

আচ্ছন্নের মতো চলতে লাগলেন সুব্রতবাবু। আকাশের তারা কোন্ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছে কে জানে! সম্মুখে দেখা যায় কতগুলি গাছ জটলা করে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ একসময় সেখানে থেকে আলো জ্বলে উঠল। ঐ অন্ধকার থেকেই আলোর বিন্দু এগিয়ে আসতে লাগল ক্রমশ। এই নির্জন নদীতীরে, পাহাড়, অরণ্য, নক্ষত্র, নীহারিকা, আর ঐ সঞ্চরায়মান আলোর বিন্দু! এই চির-চেনা জগতের বুকে আর এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যেন! সুব্রতবাবু দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। তাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানছে ঐ আলোর বিন্দু!

অকস্মাৎ কী একটা শব্দ জেগে উঠল। এই নিস্তব্ধ নির্জন প্রান্তর শিহরিত হয়ে উঠল যেন! দূর থেকে ভেসে আসা একটা শব্দের রেশ!

প্রাণপণে এগিয়ে চললেন সুব্রতবাবু। সেই আলো, সেই আলোর বিন্দু!

তন্দ্রাচ্ছন্ন, মোহাচ্ছন্ন পথিকের মতো পথ পার হতে লাগলেন। সেই ঈষৎ কম্পিত আলোর শিখা কাছে আসতে লাগল, কাছে, অনেক কাছে!

—বাবা?

সাড়া নেই।

—বাবা? এই যে বাবা এখানে, ওরে ভুখন এদিকে আয়,

এই যে বাবা!

—কে!

—আমি বাবা, আমি মণ্টু। সেই থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই এত রাতে আপনি এখানে এসে একা একা বসেছিলেন?

—মণ্টু?

—হ্যাঁ, বাবা। এই ভুখন, বাবাকে ধর। সাবধানে উঠবেন বাবা, বালিতে পা ডুবে যাবে। এই যে, ঠিক হয়েছে, এইবার আমার হাতটা ধরুন।

—মণ্টু?

—কী বাবা?

—কোথায় গেছলি?

—ফুলডুংরীর ওদিকে বেড়াতে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি এসে শুনি আপনি নেই। রাত হয়ে গেল দেখে আমি আর ভুখন খুঁজতে বেরিয়েছি।

মুহূর্তে সব কিছু ভুল হয়ে যায় সুব্রতবাবুর। কী করতে এসেছিলেন, মণ্টুকে কী কী বলা দরকার সব তার গোলমাল হয়ে গেল। কোথায় তিরস্কার করবেন, তা নয়, সস্নেহে হাতখানা রাখলেন ছেলের মাথার ওপর, কোমল কণ্ঠে ডেকে উঠলেন—

—মণ্টু?

—কেন বাবা?

—একটু দাঁড়া।

ফিরে তাকালেন। সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিন্ন ছিন্ন প্রস্তরের স্তূপ!

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপরে বললেন,—হ্যাঁরে, এ যায়গাটার নাম কী রে?

মণ্টু বললে,—রাতমোহনা।

ঢেউ ওঠে, ঢেউ আবার মিলিয়ে যায়, এই-ই ত সংসারের নিয়ম। সুব্রতবাবু তাঁর কারখানার অফিস আর দাবা খেলার সান্ধ্য-আসরের মধ্যে ডুবে গেলেন। তাঁর গৃহিনী আছেন সংসারের দৈনন্দিনতা নিয়ে ব্যস্ত,—মণ্টু যে লক্ষ্মী-ছেলের মতো তার পড়াশুনা নিয়ে রয়েছে, কলকাতার কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছে, ছুটিতে ছুটিতে বাড়িতে আসছে,—এবং ছেলের যে আর 'ওসব' দিকে মন নেই, ওটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে তিনি খুসীও হয়েছেন, নিশ্চিন্তও হয়েছেন।

কিন্তু, এ ঘটনার অন্য দিকটা? প্রতিবেশী হরি মুখুজ্যের চতুর্দশী কন্যার হাতে চিঠিটা যখন পৌঁছয়, সে তখন ভয়ে একেবারে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। তার ছোট ভাই স্বপন এনেছিল চিঠিটা। বলেছিল—তোমার চিঠি। মণ্টুদা দিলো।

জানলার ধারে রোদ্দুরে চুল শুকোতে শুকোতে বই পড়ার অভ্যাস কণিকার। কতদিন মুখ তুলে দেখেছে কণিকা, তার জানালার সামনা সামনি জানালাটা খুলে, পাশের বাড়ির ওর ছোট ভাই স্বপন-তপনের সেই মণ্টুদা, ভালো নাম—অনুপম, তাকিয়ে আছে তার দিকে! কখনো কথা বলেনি সে ওর সঙ্গে, কণিকাও কথা বলার জন্য খুব যে উৎসুক হয়েছে এমন নয়। তবে, ছেলেটা কীরকম এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে যে তাকাতো মাঝে মাঝে, লক্ষ্য করে রীতিমত অবাক হয়ে যেতো ভিতরে ভিতরে।

তারপরে, এলো এই চিঠি।

বেশীদিন নয়, মাত্র বছরখানেক হলো তারা এসেছে ঘাটশিলায়। তার বাবার সরকারী চাকরী, সরকারের কী বিশেষ কাজে তার বাবাকে কারখানায় কারখানায় ঘুরতে হয়। বদলীর চাকরী, কোন দিন হুট করে আবার চলে যেতে হবে ঘাটশিলা থেকে, কে জানে! তখন আবার জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধি, আবার পড়ে যাবে চলে যাবার তাড়া। বাড়ির সে তখন একমাত্র মেয়ে বলা যায়, বড়দি-মেজদির

বিয়ে হয়ে গেছে, কণিকার পরে দুটি ভাই,—ছোটই তারা—তপন আর স্বপন। তারা খেলাধূলা করে বেড়ায়, কতো খেলার সাথী তাদের! কিন্তু, কণিকা কারুর সঙ্গে মিশতে পারে না, একা একা নিজের মনে থাকতে ভালো লাগে ওর। নইলে তার সমবয়সী কতো মেয়ের সঙ্গেই তার আলাপ হয়ে যেতে পারত ইতিমধ্যে!

এই সব কার্যকারণের ফলেই বোধহয় ভিতরে ভিতরে সে এক ভীরু বালিকায় পরিণত হয়েছিল তখন। 'তুমি আমার প্রেরণা!—'তুমি আমার প্রেরণা'—কী সব অদ্ভুত-অদ্ভুত কথাই না লিখেছে স্বপন-তপনের মণ্টুদা! পড়ে, বুকটা একেবারে ধরাস-ধড়াস করে উঠেছিল! মনে হচ্ছিল, বুকের ভিতরে ধুক্‌ধুক্ করে যে হৃদ্‌পিণ্ডটা, সেটা বুঝি আর বাজছে না, নিস্পন্দ নিথর হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য! গলাটাও কেমন হঠাৎ শুকিয়ে গিয়েছিল, ঢকঢক করে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেলে ভালো হতো বুঝি!

কতোক্ষণ যে অমন বিহ্বলভাবে তার কেটে গিয়েছিল কে জানে, হঠাৎ চমক ভাঙল মায়ের ডাকে। এবং চমকে সে লক্ষ্য করল, মা তার হাত থেকে চিঠিখানা নিজের হাতে উঠিয়ে নিয়েছেন খপ করে!

—কার চিঠি রে? দেখি দেখি?

বাধা দেবারও অবকাশ পায়নি সে, কিছু বলারও অবসর হয়নি, তার মা ততক্ষণে চীৎকার করে একটা হুলুস্থুল কাণ্ডই বাঁধিয়ে তুলেছেন!

পর মুহূর্তেই কণিকার চুলের মুঠিতে পড়ল এক টান। মা রেগে গিয়ে তার চুল ধরে মাথাটাকে বার কয়েক নাড়া দিলেন বেশ করে। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে গেল কণিকার। মা বললো, —এক ফোঁটা মেয়ে, তোর পেটে পেটে এতো! লুকিয়ে লুকিয়ে ওই সব হচ্ছে! আসুক তোর বাবা!

ঘৃণায় লজ্জায়, ব্যথায় বেদনায় কণিকার মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে

সে যদি মাটির মধ্যে তলিয়ে যেতে পারত, ত, বোধহয় ভালো হতো! কোনোক্রমে সে বলে উঠল—আমি জানি না মা, আমার কোনো দোষ নেই!

এবং, সে যে সত্যিই কিছু জানে না, তার সাক্ষী তপন-স্বপনও দিয়েছিল এসে।

আর, তারপর? ছ-ছটা মাস কেটে গেল, মণ্টুদাও চলে গেল কলেজে পড়তে, আর কী আশ্চর্য, তার বাবারও এসে গেল বদলির নির্দেশ, শুধু বদলি নয়, প্রমোশন। একেবারে কলকাতার অফিসে গিয়ে এবার থেকে বসতে হবে তার বাবাকে, আর এ কারখানা সে কারখানা নয়!

বাড়ির সবাই আনন্দে মত্ত, কিন্তু চলে যাবার মুহূর্তে, কণিকার মনটা হঠাৎ কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। তপন-স্বপনের মণ্টুদা, অর্থাৎ অনুপম, আর কখনো তাকে কোনো চিঠি লেখেনি। এমন কি, সে যখন রোদ্দুরে জানালায় বসে ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে চুল শুকোতে বসত, তখনও কেউ আর পাশের বাড়ির জানালা খুলে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে তেমন করে দেখতে চেষ্টা করত না!

সেই যে তুই বাড়িতে ঢেউটা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, সেটা আপনিই আবার মিলিয়ে গিয়েছিল, কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কোনো দিকে কোনো চিহ্নও নেই!

চিহ্ন থাকলে কী ভালো হতো?—নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে কণিকা। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই বুকটা নিদারুণ ভয়ে আর সংকোচে কেঁপে ওঠে! ছি ছি, এসব কী ভাবছে সে?

চলে যাবার মুহূর্তে, পাশের বাড়ির গৃহিনী, অর্থাৎ অনুপমবাবুর মা দেখা করতে এলেন। কণিকার মাকে বললেন—দিদি, গরীব বোনটিকে ভুলো না।

সেই চিঠি আসার ঘটনার পর থেকে তুই বাড়ির তুই গৃহিনীর মধ্যে হঠাৎ খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল! ফলে, অনুপমবাবুর মাকে

কণাও ডাকতে আরম্ভ করেছিল মাসীমা বলে। মাসীমা মাঝে মাঝে ছেলের গল্প করতেন বই কী! ঐ মণ্টুই ত তার বড়ো ছেলে! বাপ সখ করে নাম রেখেছেন—অনুপম। সে নাম ত খাতায়-পত্রেই শোভা পায়, বাপ-মায়ের কাছে ও মণ্টুই। আসলে খুব লাজুক ছেলে ও, কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না! বই মুখে করেই সারাদিন কাটায়, আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই! আলতার শিশিটাকে জবাকুসুমের শিশি বলে ভুল করে একদিন আলতাই খানিকটা মাথায় ঢেলে ফেলেছিল স্নান করতে যাবার আগে!

মা বলত—ছেলে কলেজে পড়ছে, তোমার আর ভাবনা কী!

—ভাবনা আছে বই কী দিদি—অনুপমবাবুর মা বলতেন,—অবস্থা আমাদের জানো ত? ছেলেকে কলকাতার কলেজে পড়ানো কি সোজা কথা? কী এমন আয় যে, হোষ্টেলে রেখে পড়াতে পারি? ছেলে তবু ভালো, টুইশানী করে হোষ্টেলের খরচ কিছুটা তুলতে চেষ্টা করছে!

আজ, যাবার দিন কণিকার মা বললেন,—মণ্টুকে লিখে দাও, আমরা কলকাতায় যাচ্ছি ত? এসে যেন দেখা করে।

—নিশ্চয়ই লিখব দিদি। আজই লিখে দিচ্ছি।

কথাটা শুনে আবার অদ্ভুত ধরণের এক আতঙ্ক অনুভব করল কণিকা। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে আবার কেঁপে উঠল কয়েক বার!

কিন্তু, কোথায় সে? কলকাতায় এ তাদের নিজেদের বাড়ি, নিজেদের ঘর। এখানে এসে মনটা বেশ খুসীই আছে কণিকার। কাছেই লেক, তপন-স্বপনের সঙ্গে ইচ্ছা হলেই বেড়াতে যায় সে। কিন্তু, দেখতে দেখতে বারোটা মাস, মানে একটা বছর কেটে গেল। ঘাটশিলা থেকে মার কাছে মাসীমার চিঠি আসে মাঝে মাঝে, তপন-স্বপনের মণ্টুদার খবরও থাকে, কিন্তু কোথায় সে? কত দূরে, কোথায় তার হোষ্টেল? একবার এসে ওর মার সঙ্গে দেখাও

ত করে গেল না?

মনটা মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায় বই কী! আবার ভাবে যদি সত্যিই এসে পড়ে, ত কী হবে? মুখ দেখাতে পারবে তাকে কণা? ছি-ছি, লজ্জা করবে না? কিন্তু, কেনই বা লজ্জা, কিসেরই বা লজ্জা? আচ্ছা, তার সেই চিঠির উত্তরে সে যদি একটা চিঠি লিখত? লিখতে পারে না? খুব লিখতে পারে কণা। স্কুলের বাংলা রচনা তার খুব সুন্দর হয়। কিন্তু, বাংলা রচনা লেখা এক জিনিষ, আর, চিঠি লেখা আরেক জিনিষ! কী-সব কথা সে লিখত? ভাবতে গিয়ে মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে কণার!

ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে এলো! গা-ধোয়ার পালা সাঙ্গ করে আবার তার ঘরটিতে এসে বসল কণিকা। কতো ঘর তাদের! নীচের দুটো তলা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুরো তে-তলাটা ত তাদের! এছাড়া, নীচে পড়বার আর বসবার ঘর,—দু' দুখানা ঘর রয়েছে তাদের দখলে, আর রয়েছে ওপরের চিলে কোঠার ঘরখানা। হাষ্টেলে না থেকে ঐ চিলেকোঠার ঘরখানায় এসে থাকতে পারত না কি, তপন-স্বপনের সেই মন্টুদা,—যার নাম—অনুপম? ঐ ত সংসারের অবস্থা, তাতে আবার কলেজের হোষ্টেলে থেকে পড়া কেন বাপু? হাড় জির-জিরে ছেলেটার দেমাক আছে এদিকে!

ঘরে, ঝি এসে দাঁড়ালো চা নিয়ে। বলল—মাস্টার দিদিমণি এয়েছেন গো, নীচে।

—যাচ্ছি।

কণার এবার পরীক্ষার বছর, ভালভাবে পড়াশোনা করবার জন্য বেছে বেছে ভালো টিচার রাখা হয়েছে।

ছাত্রীর পড়বার ঘরে—একতলায়—চুপচাপ বসে আছেন শিক্ষয়িত্রীটি। সিঁথিতে রক্তচিহ্ন পড়ে নি, বয়স কিন্তু তিরিশের কাছাকাছি, কিম্বা তিরিশ ছাড়িয়েছে। ছিপছিপে লম্বা গড়নই

বটে, চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা, একহাতে কালো ফিতে বাঁধা লেডীজ রিষ্টওয়াচ, অন্য হাতে একগাছি সরু চুড়ি, হাতে একটা পোখরাজ পাথর বসানো আংটি। গায়ের রঙটা খুব ধবধবে না হলেও, ফরসাই বলা চলে। সবুজ জামার ওপরে সবুজ পাড়ের সাদা একটা মিলের শাড়ী পরে এসেছেন।

ছাত্রী কণিকার বইগুলো সামনের টেবিলে ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে, তার মধ্য থেকে একখানা বই খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই তুলে নিলেন হাতে। উলটে-পালটে দেখলেন, চিরপরিচিত সেই ভূগোলখানা,—স্কুলে দিনের পর দিন, এমনকি প্রাইভেট টুইশানীতে এসেও যে বইখানা ওঁকে নিষ্কৃতি দেয় না।

বসে বসে আনমনে পাতা ওলটাতে লাগলেন বইখানার। এক জায়গায় চোখ পড়তেই পাতা ওলটানো বন্ধ হয়ে গেল। চোখে পড়ল বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা রয়েছে—বোষ্টন! আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মস্ত বড়ো শহর—বোষ্টন!

বোষ্টন—বোষ্টন! সত্যি কথা, শশাঙ্ক না আছে এই বোষ্টনেই? কত বছর হয়ে গেল বোষ্টন চলে গেছে শশাঙ্ক,—আজও তার খবর নেই,—নিখোঁজ। বোধহয় বছর দশেক হয়ে গেল। না-না, অতো নয়, আট বছর হবে। ওর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে শশাঙ্ক বলেছিল,—'তুমি প্রতীক্ষা কোরো রমা, আমি আবার ফিরে আসব তোমার কাছে।'

ঠোঁটের কোণে ম্লান একটা হাসি ফুটে ওঠে—আর কতদিন? সময় কী হয় নি এখনও?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার হাতের বইখানা ওলটাতে লাগলেন, ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ বইটা থেকে কী একটা খসে পড়ল। কী এটা? ভাঁজ করা একখানা কাগজ,—মনে হলো যেন কার চিঠি। কাগজখানা আবার ঠিক করেই রেখে দিচ্ছিলেন তিনি—হঠাৎ কী মনে করে খুলে ফেললেন সেখানা। হাতের

লেখাটা তার ছাত্রী কণিকার। দেখলেই চেনা যায়। কিন্তু, পড়তে গিয়ে মনে হয়, চিঠি বোধহয় নয়,—বোধহয় ডায়রীর একটা পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠার ওপরে নম্বর রয়েছে,—তিন। ভয়ানক কৌতূহল হলো। ছাত্রী তখনো ওপর থেকে নীচে নামে নি, অবসর বুঝে পৃষ্ঠাটা তিনি পড়তেই শুরু করলেন,—'ওর চিঠি পেলাম। লিখেছে, আজ সন্ধ্যায় নতুন লেকটার দক্ষিণে রেল লাইনের কাছে যেখানে কতগুলি তাল আর নারকেল গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সে অপেক্ষা করবে।—আমার সঙ্গে নাকি তার দেখা হওয়া চাই-ই,—কী যেন একটা দরকারী কথা আছে। মনে মনে হাসি, দরকারী কথাটা যে কী, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। যাই হোক, ওর কথাটা আজ রাখতে হবে। সন্ধ্যায় আজ আর পড়বো না, মাথা ধরার ছুতো করে ছুটি নেবো।'—

আর পড়লেন না তিনি, কাগজটা ভাঁজ করে বইখানার ভিতরেই রেখে দিলেন। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল বাঁকা হাসি। —লুকিয়ে লুকিয়ে ঐটুকু মেয়ের তাহলে এই সব হচ্ছে? অবশ্য এ জন্য মেয়েটাকে কী কঠিন ভাবে তিরস্কার করা চলবে? বোধহয় নয়। এখন ত ও তবু ষোলো।—নিজের সেই চৌদ্দ বছর বয়সটাকে মনে পড়ল তার।—সেই অবসর বুঝে ছাদে দিয়ে দাঁড়ানো, আর পাশের বাড়ির ছাদের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে চেয়ে দেখা! শশাঙ্কদার বয়স তখন বোধহয় কুড়ির বেশী হয় নি।

কিন্তু, কণিকা মেয়েটা কেমন যেন বোকা। একটা খোলা—আলগা কাগজে কি কেউ ডায়রী লেখে? আর লিখলেও সেটা কি কেউ এমনভাবে যেখানে সেখানে ফেলে রাখে?—আর বিশেষতঃ এই সব লেখা! তিনি না হয় নেহাৎ করুণা করেই এটা উপেক্ষা করে গেলেন,—কিন্তু বাড়ির অভিভাবকদের কারুর হাতে যদি এ সব পড়ত? তখন কী দশা হতো কণিকার?···ওকে একবার সাবধান করে দেবেন নাকি? পাগল, তাও কি হয়,—শিক্ষিকা হয়ে

ছাত্রীকে তিনি এবিষয়ে কী-ই বা বলতে পারেন? শুধু তা-ই নয়, তিনি যে এ বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছেন এটাও বিন্দুমাত্র জানতে দেওয়া তাঁর উচিত হবে না।

এতক্ষণে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ বেজে উঠেছে কণিকার! ওঁর হাসি পায়, মেয়েটা এসে ওঁকে যে কী বলবে, তা ওঁর বেশ জানা। মেয়েটার মুখখানা নিশ্চয়ই একটু শুকনো শুকনো দেখাবে, মৃদু পায়ে সে ঘরে ঢুকবে, তারপরে একটু ইতস্ততঃ করেই বলবে,—'রমাদি, আজ একটু ছুটি দিন না, বড্ড মাথা ধরেছে।'

উত্তরে রমাদি কী বলবেন? বলবেন,—'না, পরীক্ষা তোমার সামনে।'—এই বলবেন? না, না,—অতটা নির্মম তিনি কিছুতেই হতে পারবেন না।

ঘরে এলো কণিকা। ওঁর অনুমান মিথ্যা নয়,—মেয়ের মুখখানা দস্তুরমতো শুকনো দেখাচ্ছে। টেবিলের ধারে এসে ধীরে ধীরে বসল কণিকা। এইবার……। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করবে, আর সেটা স্বাভাবিকও, তারপরে ধীরে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলবে…।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই বলছে না মেয়েটা, দিব্যি বই খুলে বসেছে! ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলো,—ছুটি যখন নিতে হবেই, তখন এত ইতস্ততঃ ভাব কেন বাপু?

রমাদি ছদ্ম গাম্ভীর্যেই বললেন,—খোলো বই, পড়া দেখাও।

ভূগোল? সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে পড়ে গেল আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের কথা,—বোষ্টন নগরীর কথা।

—আচ্ছা, বলো ত কণা, হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি কোথায়?

—হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নাম শোনো নি?

—না ত!

—আশ্চর্য! খোলো বই, দেখিয়ে দিচ্ছি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। পড়া শুরু হলো কণিকার। ওর মনটা

যে লেকে যাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে সেটা—অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছে না ছুটি চাই। অবশ্য ওর সংকোচটাও বুঝতে পারছেন রমাদি, কিন্তু তা হলেও ছুটি চাইলে কিছু মনে করতেন না তিনি। সত্যি মেয়েটার অবস্থা দেখে বড্ড মায়া হয়।

অবশেষে রমাদিই উঠে দাঁড়ালেন। যে ভীরু মেয়ে, নিজে ত আর ছুটি নিতে পারল না, অতএব ওঁকেই নিতে হলো ছলনার আশ্রয়। বললেন,—দেখ কণা, মাথাটা ধরেছে আজ। পড়াতে পারছি না—আজ তোমাকে ছুটি দিলাম, বুঝলে?

অমনি ঠিক প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে মেয়েটার মুখ! রমাদি বললেন,—আর শোনো, পড়তে এখন ভালো না লাগলে বরং লেকে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এসো।

বলেই মনে মনে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন রমাদি। মেয়েটা আবার যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে, তিনি ও সব বিষয়ে বিন্দুমাত্রও জানতে পেরেছেন।

তাড়াতাড়ি রমাদি বেরিয়ে এলেন বাইরে। দীর্ঘ পথটার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে,—স্নিগ্ধতায় ভরা সুন্দর এক গোধূলি-লগ্ন! ঠিক এই মুহূর্তে যদি নিরালা কোনো যায়গায় গিয়ে তিনি বসতে পারতেন! পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর শান্তি। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যেত নিঃসীম নির্জনতার মধ্যে।

পথ চলতে লাগলেন রমাদি। সামনেই মোড়। মোড়ের ডান দিকে ঘুরলেই নতুন লেক। যাবেন না কি তিনি একবার লেকে? এই ত সেই রেল লাইনের ধারের নারকেল গাছগুলো ওঃ! কতদিন যে তিনি আসেননি এখানে!···ভালো কথা, কণিকাও না আসবে এখন? কে একটি ছেলে ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না ওখানে? দেখাই যাক না?···নারীসুলভ অদম্য কৌতূহল বশতই নারিকেল-কুঞ্জের দিকে পা বাড়ালেন রমাদি।

কিন্তু অপেক্ষমান ছেলেটিকে ভয়ানক চেনা চেনা ঠেকতে লাগল

একটু দূর থেকে! কে ঐ ছেলেটি?···আরও এগিয়ে গেলেন রমাদি। আরে, এ যে সৌম্যেন, তাদের স্কুলের টিচার মিসেস্ সোমের ছেলে সৌম্যেন।

—তুমি এখানে, সৌম্যেন?

ঠিকই ধরেছেন রমাদি, নইলে ওর ঐ সামান্য প্রশ্নে ছেলেটা অমন অপ্রস্তুত হয়ে উঠল কেন? তা হলে, সৌম্যেনই হলো কণিকার···।

একটু ইতস্ততঃ করবার পর উত্তর দিলো সৌম্যেন,—এই··· মানে···মানে···এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা···এই আর কী!

হাসি পেলো রমাদির,—শশাঙ্কদা, একেবারে শশাঙ্কদার মতো সেই সলজ্জ ভঙ্গীতে 'মানে···মানে' বলে ওঠা! এ বয়সের সব ছেলেই কী সমান?

এগিয়ে গেলেন রমাদি। সামনে একটা খালি বেঞ্চ। এখানে একটু বসবেন নাকি তিনি? মন্দ হয় না, এতখানি হেঁটে এসে পা-টা ধরে গেছে। কিন্তু ওরা আবার দেখতে পাবে না ত? কণিকা এসে ওঁকে দেখলে লজ্জাই পাবে হয়ত। তা হোক। বেঞ্চিতে শেষ পর্যন্ত বসেই পড়লেন রমাদি। কণিকা এলে ওদিকে তিনি তাকাবেন না, মুখ ফিরিয়েই থাকবেন।

বেশীক্ষণ বসতে হলো না, একটু পরেই দেখা গেল কণিকাকে। অবশ্য একা আসে নি, এগারো-বারো বছরের ছোট ভাইটি রয়েছে সঙ্গে।

নারকেল-কুঞ্জের কাছে এসে থামল কণিকা,—ঐ যে দেখা যাচ্ছে ওকে,—নীচু হয়ে জুতোটা ঠিক করে নিচ্ছে। অবশ্য এটা হলো ভূমিকা। সৌম্যেনও চেয়ে আছে কণিকার দিকে।

কিন্তু মেয়েটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ওঁকে দেখতেই পেয়েছে। সৌম্যেনকে ছাড়িয়ে ওঁর দিকেই এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি, বলল— কী মজা! রমাদি, আপনিও এখানে!

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন রমাদি, বললেন,—হ্যাঁ, এই এলাম একটু বেড়াতে-বেড়াতে। কিন্তু...

—কী রমাদি?

রমা বেশ বুঝতে পারেন ওদের সংকোচ আর লজ্জার ভাব। এবং বুঝে নিয়ে উনি এক মুহূর্তে কী যেন ভেবে নিলেন। তারপর সৌম্যেনকে নির্দেশ করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—চেন ওকে? এসো আলাপ করিয়ে দেই।

—কে উনি!

—এসোই না?

কী আর করা যায়, নিজের হাতে যখন ওরা এমন লগ্নটাকে মাটি করে দিতে যাচ্ছে, তখন ওঁকেই দিতে হবে ওদের ভয় ভাঙিয়ে। সুতরাং এগিয়ে গেলেন নারকেল কুঞ্জের দিকে।

—সৌম্যেন, শোনো?

কাছে এসে দাঁড়ালো সৌম্যেন।

—এ হচ্ছে শ্রীমান সৌম্যেন সোম, আর এ আমার ছাত্রী কণিকা মুখার্জী।

ছেলেটা কিন্তু শশাঙ্কর মতোই লাজুক, চেষ্টা করেও যেন বলতে পারছে না,—ওকে আমি চিনি।

কিন্তু ঐ যে ওদের চোখেমুখে একটা সলজ্জ আভা ফুটে উঠছে—ওটা তাঁর চোখ এড়িয়ে কোথায় লুকোবে ওরা?

—নমস্কার।

—নমস্কার।

কিন্তু, সৌজন্য বিনিময়ের পরই ওরা দুজন চুপচাপ হয়ে গেল। রমাদি বলে উঠলেন—আসবে না কি সৌম্যেন, আমাদের সঙ্গে?

—আজ নয়, আজ আমাকে ক্ষমা করুন।

না, আদৌ সাহসী নয় সৌম্যেন। রমাদি কী তা বলে বেশীক্ষণ থাকত ওদের সঙ্গে? এখ্খুনি চলে যেতো। তারপরে ওরা

ছু'জনে লেকের ধারে পাশাপাশি বসে থাকুক যতক্ষণ ইচ্ছা,—অ-রসিকের মতো কেউই আর আসত না বাধা দিতে।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর কী ভেবে রমাদি হঠাৎ কণিকাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—সৌম্যেনকে তুমি আগে থাকতেই চিনতে, না কণা?

—না ত!

কী অদ্ভুত মেয়েটা, এখনো ওঁর কাছে ঢাকবার চেষ্টা করছে!

—একেবারেই চিনতে না ওকে?

—না।

কী আশ্চর্য, তাহলে কণিকার সেই ডায়রীর তিন নম্বরের খোলা পৃষ্ঠাটা!

রমাদি একবার পিছন ফিরে সেই নারকেল-কুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সৌম্যেন যার জন্য অপেক্ষা করছিল, ওর সেই বন্ধুটি এসেছে এতক্ষণে। ওরই সমবয়সী একটি ছেলে। তার সঙ্গে ওদিককার পথে চলে গেল সৌম্যেন।

এর মানে? তাহলে কী তিনি কোন ভুল করলেন নাকি? রমাদি ঘুরে দাঁড়ালেন। কী ছুর্বোধ্য ব্যাপার! হঠাৎ একটা সন্দেহ দোলা দিয়ে গেল ওঁর মনে।

হঠাৎই তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন—আচ্ছা কণা, তুমি কি গল্প-টল্প লেখো?

সলজ্জ একটু হাসল কণিকা, বলল,—আপনি কী করে জানলেন?

—তুমি বলোই না!

একটুক্ষণ থেমে থেকে কণিকা বললে—হ্যাঁ, লিখি একটু আধটু। এইত আজ, আপনি আসার আগে একটা লিখছিলাম।

মুহূর্তে কুয়াশা মিলিয়ে গিয়ে রমাদির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল সব কিছু।

আর একটি কথাও না বলে দ্রুত পায়ে পথ চলতে লাগলেন তিনি। সারা লেক অঞ্চলটাকেই তখন ওঁর ভয়ানক অসহ্য লাগছিল!

প্রথম প্রেমের অস্ফুট পদধ্বনি রমাদির সমস্ত চেতনাকে যেন সম্পূর্ণ শিথিল করে দিয়েছিল!

রমাদির সঙ্গে আর কোনো দিন এবিষয় নিয়ে কথা হয়নি কণিকার। যে কয় মাস এরপর ছিলেন, ঘড়ি ধরে পড়াতেন, পড়িয়েই চলে যেতেন। কিন্তু, সেদিনের সেই ঘটনা কণিকার ষোড়শী মনে যে ঝংকার তুলেছিল, তার রেশ কি অতো সহজেই মিলিয়ে যাবার? খেয়ালের বশে স্কুলের এক সহপাঠিণীর সঙ্গে জেদ করে গল্প লিখতে গিয়েছিল কণিকা। নইলে, সত্যি সত্যিই লেখিকা হয়ে দাঁড়াবে এমন কোনো অভিলাষ তার ছিল না। এবং তার সেই গল্পটির এক হারানো পৃষ্ঠা নিয়ে সেদিন যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল রমাদির মনে, তার কার্যকারণ সম্বন্ধে কণিকা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকলেও, একটা কিছু যে ঘটেছে রমাদির অন্তর্লোকে, এটা সে বুঝতে পেরেছিল।

সংকোচ বশে রমাদিকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নি কণিকা। কিন্তু নিজের মনে মনে ব্যাপারটা নিয়ে বারবার পর্য্যালোচনা না করে পারে নি। পর্য্যালোচনা আর সে করবে কী, তার লেখা ঐ অসমাপ্ত গল্পটা নিয়েই চিন্তা করেছে নিজের মনে বসে। সেই ঘাটশীলা, আর সেই অনুপম, অর্থাৎ তপন-স্বপনের সেই মণ্টুদা—সব যেন একাকার হয়ে গেছে গল্পে! তার অসমাপ্ত গল্পের নায়ক, যে লেক এর ধারে এসে নায়িকার সঙ্গে দেখা করে, তার মধ্য দিয়ে যেন সেই ভীরু আর লাজুক ছেলে অনুপমই উঁকি দিচ্ছে বার বার।

এটা কেমন করে হলো? নিজেই মনকেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে করতে হঠাৎ অহেতুক একটা ভয় আর নিদারুণ লজ্জা যেন মুহূর্তে ঘিরে ধরল তাকে! এবং তারই ফলে, তার অসমাপ্ত গল্পের পৃষ্ঠা কটি সে নির্মম হস্তে ছিড়ে ফেললো টুকরো টুকরো করে!

—কী হলো রে, তোর গল্প ?

সহপাঠিনীর প্রশ্নের উত্তরে সে সংক্ষেপে বলেছিল—গল্প আর লেখা হবে না।

—কেন ? মত বদলালো কেন ?

—এমনি।

—উঁহু, এমনি নয়। বলবিনা ?

—কী বলব ?

সহপাঠিনী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল, বলল—আমি জানি।

—কী জানিস ?

—তোর বিয়ে হচ্ছে।

—যাঃ—লজ্জায় মুখখানা মুহূর্ত্ত আরক্ত হয়ে উঠল কণিকার। ছুটে পালালো কণিকা। অথচ, কথাটা মিথ্যে নয়। মা বাবা বলাবলি করছিল সেদিন নিজেদের মধ্যে।

—মেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, বিয়ে দিতে হবে না ?—মা বলছিল—ধিঙ্গি করে রাখা আমার পছন্দ নয়। পড়াশুনো করে কী হবে মেয়ের ? বিয়ের চেষ্টা করো। মেয়ে কী দেখতে খারাপ ? বার করো আমার মেয়ের মতো সুন্দরী মেয়ে পাড়া খুঁজে ? ওকে দেখালেই পছন্দ হয়ে যাবে !

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনেছিল কণা, আর ওর সারা শরীর যেন ঘেমে উঠছিল।

আর আশ্চর্য, বাবা অমনি রাজি হয়ে গেল মায়ের কথায়।

সারা মন-প্রাণ ভরে সে এক আশ্চর্য সুর-ঝংকার ! ভালো কি মন্দ, আনন্দ কি বেদনা,—ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু সমস্ত মন যেন কীসের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চায় অনুক্ষণ !

দিন যায়। এরই মধ্যে আসে আরেক আশ্চর্য খবর ! ঘাটশিলার মাসীমা ত প্রায়ই চিঠি লিখতেন মাকে, মা-ও তাকে লিখতো, কী যে

লিখতো কণা জানে না। জানবার কৌতূহলও তার ছিল না কোনো দিন।

হয়ত চিঠি এলো—ছেলের পরীক্ষা একেবারে সামনে, হোষ্টেলে পড়াশুনার তেমন সুবিধা হচ্ছে না, ও কী তাদের বাড়িতে কয়েক মাস এসে থাকতে পারে? মা অমনি লিখে দেয় উত্তর,—স্বচ্ছন্দে। মন্টু কি আমাদের পর? কতোবার ত আমরাই কথাটা তুলেছি, তোমার ছেলেই কানে নেয় না!

এই এতদিন পরে, মানে, বছর কাটিয়ে বলা যায়, অবশেষে তপন স্বপনের মন্টুদা এসে দাঁড়ালো তাদের দরজায়। সুট্‌কেশ আর বিছানা, রিক্সা থেকে নামছে, তেতলার জানালার আড়াল থেকে ঠিক দেখতে পেয়েছে কণা! বাপরে, কী লম্বাই না হয়ে উঠেছে ছেলেটা! আর, কী রোগা!

মার আদিখ্যেতার শেষ নেই! তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো তপন স্বপনের সঙ্গে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে।

আর, তারপর? সেই চিলেকোঠার ছাদে হলো গিয়ে তার আস্তানা। তার মানে, যখন তখন যে ছাদে গিয়ে দাঁড়ানো, তার আর উপায় রইল না কণার। কেউ অবশ্য বারণ করে নি, কিন্তু তবু, নিজের একটা সঙ্কোচ আছে না?

দিন কাটতে লাগল। ছেলে বাড়িতে থাকে যেন চোরের মতো। কখন নীচে নামে, কখন স্নান করে, কখন খায়—কিছুই টের পাবার উপায় নেই! কখনো সখনো খাবার ঘরের বারান্দায় মার সামনে পড়লে, মা হয়ত বলেন—শরীরের যত্ন নাও না কেন বাবা?

কিম্বা,—আই-এ পাশ করে বেরিয়ে আরও পড়বে ত?

কিন্তু, মায়ের প্রশ্নের উত্তরে নীচু গলায় কী যে বলে, বোঝবার উপায় নেই!

দু-একবার মার ডাকে কণিকাকে মার সামনে গিয়েও পড়তে যে না হয়েছে এমন নয়!

—চিনতে পারছ ত বাবা? কণা?

কিম্বা,—প্রণাম করেছিস তোর মণ্টুদাকে?

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করেছে। কোনক্রমে ঢিপ করে একটা প্রণাম করেই ছুটে পালিয়ে গেছে কণা। ঘর থেকে একেবারে বাইরে! এসে মনে মনে বলেছে—মা যেন কী!

অবশ্য, কিছুদিন কেটে যাবার পর অতটা সঙ্কোচ আর থাকে না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে কতোবার দেখা হয়ে যায়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অনুপম। প্রথম প্রথম কথা বলত না অনুপম। একদিন নিজে থেকেই কথা বললো, ডাকলো—কণা?

—কী?

—না কিছু নয়, মানে—

ভীষণ হাসি পেতো কণার, হাসি চেপে মুখ নীচু করে কোনক্রমে পালিয়ে আসত ওর কাছ থেকে।

তারপরে, যেমন ওর ছাদে যাওয়ার অভ্যেস ছিল তেমনি যেতে শুরু করল। ইতিমধ্যে হয়েছে কী, রমাদি আর পড়াতে আসেন না, কী এক কঠিন অসুখ ছিল তাঁর, ধরা পড়েছে সম্প্রতি। আছেন সেই কতদূরে—কোথায়—কাসৌলী স্যানাটোরিয়ামে। বাবা বল্লেন, —নতুন মাষ্টার ঠিক করি?

মা বলেন,—কী হবে মাষ্টার দিয়ে? ওর আর পড়তে হবে না। তুমি ঘটকমশাইকে আর তাড়া দিয়েছিলে? ভালো পাত্র চাই বলে দিচ্ছি, যেমন দেখতে সুন্দর হবে, তেমনি বিদ্বান হবে, তেমনি বড়লোক হবে! মেয়ে আমার রূপে-গুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী। মনে থাকে যেন কথাটা, হ্যাঁ?

সেই থেকে কণিকার স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। ওর নিজের তেমন গা ছিল না পড়ায়, এখন অভিভাবকেরা ভাঁটা দেওয়ায় ওরও আলস্য এসে গেছে।

যখনই ছাদে যায়, গিয়ে দেখে, বই মুখে করে বসে আছে অনুপমদা।

ওকে দেখে উঠে আসে এক-একদিন।

—তোমাদের কতো অসুবিধা করলাম।

মুখ তুলে তাকায় কণিকা, জিজ্ঞাসা করে—কীসের অসুবিধা?

অনুপম বলে—এই যে আমি এখানে আছি।

—আহা! তাই বুঝি?

—নয়?

—মোটেই নয়। মা আপনাকে কতো ভালবাসে, তা জানেন? আর, তপন-স্বপন?

ধীর, নিম্নকণ্ঠে উত্তর দেয় অনুপম—জানি। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনেরও খবর জানি।

সমস্ত শরীরটা যেন কেঁপে ওঠে কণার। মুখখানা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে যায়।

ভয় পেয়ে অনুপম বলে—কী হলো? আমি ঠাট্টা করছিলাম।

কিন্তু কে শোনে তার কথা? কণা সঙ্গে সঙ্গে বন্য হরিণীর মতো ছুটে পালিয়ে যায়।

তারপরে, বহুদিন আর তার দেখা পাওয়া যায় না। যখন সে আসে, অন্য প্রসঙ্গ তোলে অনুপম। বলে—বাবার শরীর ভেঙে পড়েছে, আর খাটতে পারছেন না। আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক, আর পড়ব না, চাকরী করব। বাবাকে রেহাই দেওয়া দরকার।

—পড়বেন না?

—না। আমরা কতো গরীব, তা জানো না?

ঐ রকম কতো টুকরো টুকরো কথা হয় দুজনের মধ্যে, কিন্তু কখনো ঘাটশিলার সেই চিঠির কথা ওঠে না!

দেখতে দেখতে হেমন্তকাল পেরিয়ে শীত এসে পড়ল। শীত যেন

এক আশ্চর্য স্থুর নিয়ে এসেছে কণার জীবনে। আশ্চর্য স্বপ্নিল এক পরিবেশ!

ঘটকমশাই ভালো একটা সম্বন্ধ এনেছেন, ছেলে নিজেই নাকি দেখতে আসবে। যেমন দেখতে, তেমনি বিদ্বান আর তেমনি বড়োলোক! নিজের মোটর আছে একখানা।

চুপচাপ জানালায় বসে বসে ভাবে কণা, নিজের মনেই স্বপ্নের জাল বোনে! কখনও বিছানা থেকে ঘুম ভেঙে উঠে বসে ঠিক ভোর-বেলায়। তারপরে, মুখে-চোখে জল দিয়ে শালখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পা টিপে টিপে চলে আসে ছাদের ওপরে। কুয়াশাঘেরা শীতের ভোরে ছাদে এসে, একটি কোণ বেছে নিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে হয়ত। কুয়াশায়-কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে চার-দিক,—গায়ের গোলাপী শালটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েছে। খোঁপা-ভাঙা শিথিল চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, নিবিড় মমতায় কাঁধের ছু'পাশ দিয়ে ঘন, দীর্ঘ আর কুঞ্চিত চুলের ছুটি গোছা বুকের উপর টেনে আনল কণা।।

ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসছে সামনের বাড়ি আর পথ, কণা চোখ মেলল পরিপূর্ণ করে। বড়ো বড়ো, টানা টানা, ভাসা ভাসা চোখ ছু'টি।

তখন, সেই মুহূর্তে, সেই কুয়াশা মিলিয়ে আসা ছাদের ওপরে, ওকে কেমন দেখাচ্ছিল,—ও কী তা জানে?

এলানো ঘন চুলের বন্যা, নমনীয় সুডৌল হাত ছু'টি আলসের ওপরে ভর দেওয়া, চোখের তটে সূক্ষ্ম কাজল রেখা তখনো ছুঁয়ে আছে, কালকের পরা লাল-লাল শাড়ীটা তখনো অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমায় মিশে আছে সদ্য বিকশিত তনুদেহের সঙ্গে।

শীগগিরই ত ওর বিয়ে হবে? কুয়াশায়-কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে ও বুঝি ওর বিয়ের কথাই ভাবছিল। ভাবছিল, কেমন না জানি সে হবে!···ঘটকমশাই যা বলেছিলেন,—উজ্জ্বল হয়ত হবে তার

স্বাস্থ্য, হয়ত ও বাড়ির চারুদির বরের মতো সুন্দর করে হাসবে সে। হয়ত প্রচুর ধনী, হয়ত বিদ্বান! আর···আর···কথাটা ভাবতে গিয়ে টুকরো হাসি ফুটে ওঠে কণার পাতলা দুটি আরক্ত ঠোঁটের তটরেখায়,—যদি সে চারুদির বরের মতন সেইরকম দুষ্টু হয়!··· ওরা, মেয়েরা, সেই যে রবিবারের দুপুরে ছাদে বসে হাসাহাসি করছিল নিজেদের মধ্যে,—সেই চারুদির কথা নিয়ে? দুপুরে ঘুমিয়ে আছে চারুদি, ওর বর না চুপিচুপি ঘরে ঢুকে, চারুদির কাছে এসে, একেবারে সেই ঘুমন্ত মুখের ওপর···। ছি, ছি!—কণার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে,—সত্যি, ছেলেরা ভয়ানক দুষ্টু!···

আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে ছাদটা। কণা মুখ ফেরালো। আশ্চর্য, ছাদটার একেবারে প্রান্তে ঐ কোণটাতে কে যেন দাঁড়িয়ে! শাদা একটা চাদর গায়ে। এতক্ষণ একেবারেই চোখে পড়েনি কণার। হয়ত কুয়াশার জন্যই। অদ্ভুত! কে জাগল এত ভোরে এই বাড়িতে? তবে কী······

বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল কণার—তবে কী···

নিশ্চয়ই অনুপম···অনুপমদা। না হলে এত ভোরে ওঠার পাগলামীই বা আর কার হবে!

ওর কথা মনে হতেই কণার হাসি পেলো। কী লাজুক! দিনরাত চিলেকোঠার ঐ ছোট্ট ঘরটায় বসে কী যে মাথামুণ্ডু পড়াশুনা করে, কে জানে!

কী যেন আপন মনে ভাবতে ভাবতে এতক্ষণে অনুপমদা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। কণাকে বোধহয় এখনো দেখতে পায় নি সে।

এগিয়ে আসছে কাছে, কিন্তু কণার বুকটা আবার হঠাৎ এমন ঢিপঢিপ করে উঠছে কেন? দূর, ওকে আবার লজ্জা! চুলের একটা গোছা হাতে জড়িয়ে নিয়ে, মাথাটা একটু হেলিয়ে হাসি-হাসি মুখে ডেকে উঠল কণা,—অনুপমদা!

ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনুপম। ওর ঐ নির্বাক জড়োসড়ো ভঙ্গী দেখে আর থাকতে পারল না কণা, খিলখিল করে হেসে উঠল।—এ অবস্থা দেখলে কার না হাসি পায়!

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অনুপম। আজকাল আর ওকে দেখে তেমন সংকুচিত হয়ে পড়ে না কণিকা, রীতিমত সপ্রতিভ ভঙ্গীতে সে জিজ্ঞাসা করে—কী ব্যাপার অনুপমদা, এত ভোরে উঠেছেন যে আজ! কোন দিন ত উঠতে দেখিনি এর আগে?

রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল অনুপম, বললে—মানে··· হঠাৎ···ইচ্ছা হলো।

হঠাৎ আবার হেসে উঠল কণা।

অনুপম মুখ নীচু করেছিল, ধীরে ধীরে আবার মুখটা তুলে তাকালো ওর দিকে। ভারী কৌতুককর লাগল ওর ঐ দৃষ্টিটা। ওর কাছে এগিয়ে আসে কণা, হাসি মুখে বলে,—অনুপমদা?

—কী?

—চুপ করে আছেন যে?

—এই, দেখছি আর কী!

—দেখছেন? কী দেখছেন?

—এই···মানে···কী সুন্দর এই ভোরবেলাটা!

আবার হাসি পায় কণিকার। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যই যদি দেখবে, তবে অমন করে ওর দিকে তাকাচ্ছে কেন অনুপম? বললেই ত পারে,—দেখছি তোমাকে, কী সুন্দর তুমি!···

—সত্যি,—কণা ভাবে,—সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা ওকে এখন না জানি কেমন দেখাচ্ছে!

অনুপম নিরুত্তরেই এবার তার চিলেকোঠাটার দিকে এগিয়ে যায়।

—বারে, চললেন কোথায়?

—ঘরে।

—দূর ছাই, আপনার খালি—ঘর আর ঘর!

অনুপম ওর কাছ থেকে একসঙ্গে এত কথা বোধহয় কোনদিন শোনে নি। তার মনের মধ্যে কীসের প্রতিক্রিয়া ঘটল, কে জানে? সে হঠাৎ-ই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—এসো না? আমার ঘরে একটু আসবে?

ভোরের কুয়াসার মধ্যে অদ্ভুত এক মাদকতা মেশানো থাকে। তারই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে চকিতে কণা ওর কাছে একেবারে ঘন হয়ে আসে। তারপরে, অকারণে কেমন যেন চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে,—চলুন।

কিন্তু পরক্ষণেই থমকে দাঁড়ালো কণা, সিঁড়িটার দিকে একবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠে,—না-না, এখন থাক, অন্য একদিন···অন্য একদিন···কেমন?

তারপরে আর দাঁড়ালো না, দ্রুতপায়ে হঠাৎ-ই কী মনে করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল কণিকা। কিন্তু অনুপমদার ঘরে সত্যিই আর ওর যাওয়া হয়নি, কেমন যেন এক অহেতুক লজ্জা এসে অকস্মাৎ ঘিরে ধরল ওকে!

নিঃসঙ্গ দুপুর। শুয়ে আছে কণিকা। শুয়ে শুয়ে বুঝি ভেসে যাচ্ছে এক কল্পনার রাজ্যে! ভাবছে, ওর যে বর হবে সে যদি এখন ওর ঘরে এসে ওর সামনে দাঁড়ায়! সেই সুন্দর বলিষ্ঠ মূর্তি, ধনী আর বিদ্বান, হয়ত বা বিলাত-ফেরৎ,—যদি সে এখন মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাকে,—কণা?

দুরন্ত লজ্জায় বিছানায় একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে কণা,—দূর, যদি কেউ দেখে ফেলে, তাহলে?

ঘড়ীর কাঁটাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় অপরাহ্নের দিকে। ওরও মন এক সময় শান্ত হয়ে আসে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে

হঠাৎ একটা কথা বিছ্যতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে ওর মনে। অনুপমদা কী কণাকে ভালবাসে ?

ঘাটশিলার মাসিমা, অর্থাৎ অনুপমদার মা সেদিন চিঠি লিখেছেন মাকে। ওঁদের সাংসারিক অবস্থা খারাপ, ছেলেকে আই-এর পর সত্যিই আর পড়াতে পারবেন না,—চাকরীর চেষ্টাই দেখবেন। —কিন্তু চাকরীই বা আজকালকার দিনে হঠাৎ মিলছে কোথায় ?

সত্যি, অনুপমদারা বড়ো গরীব, কণার হঠাৎ খুব মায়া হতে লাগল ওর জন্যে। বেচারী অনুপমদা !

তারপর দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা মাস। শীত গেল, গ্রীষ্মও যায় যায়, আসছে বর্ষা। আজকাল আর কণা ছাদে আসে না,—যে রোদ্দুর আর গরম ছাদটায় !···

শীত গেল, গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা আসছে ! এ ক'মাসে কতো কী ঘটনাই না ঘটে গেল পৃথিবীতে ! অনুপমদার পরীক্ষা হয়ে গেল। তার জিনিষপত্র নিয়ে সে চলেও গেল ঘাটশিলায়। আবার খবর পাওয়া গেল সে ফিরেও এসেছে। একা নয়, সঙ্গে মা-বাবা, ভাই বোন সবাই এসেছে। বাবাকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এমন কি, বাসাও করেছে অনুপমদা,—এই রাস্তাটারই আরেক প্রান্তে,—ছোট্ট একটা বাড়ি। কণার মা প্রায়ই ছুপুরে ওদের বাড়ি যান, অনুপমদার মার সঙ্গে খুব ভাব তাঁর। কণাকেও মাঝে মাঝে যেতে বলেন তিনি। কিন্তু কেন যেন কোথাও যেতে আজকাল মোটেই ইচ্ছা করে না কণার। কেমন একটা অহেতুক লজ্জা ওকে যেন ঘিরে থাকে,—কেমন একটা আবেশ আর আলস্য ! অনুপমদার মা এসে বেড়িয়ে গেল ছুদিন, অনুপমও এসেছিল। কিন্তু ওর মন কিছুতেই যেতে চায় না।

কিছুদিন আগেই সে এসেছিল, পাশ করার খবরও জানিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আই-এ পাশ করেছে অনুপমদা। বলেছিল,—

আর পড়বে না, চাকরীর চেষ্টায় নাকি হয়রাণ হয়ে ঘোরাঘুরি করছে বেচারী! এতদিন চাকরী পেলো কিনা কে জানে?

সত্যি, কণা অন্ততঃ একবার ওদের বাড়ি গেলে পারত! অবশ্য অনুপমও পারত বুদ্ধি করে ওদের বাড়ি আরেকবার আসতে! তা আসবেনা, যে লাজুক—আবার শুধু তা-ই নয়, একটু অভিমানীও বটে। আজকাল কেমন আছে সে,—কে জানে?

কণার কিন্তু আজকাল এক-একসময় বড়ো কৌতূহল হয়। একবার ভাবে মাকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করবে,—কেমন আছে ওরা—চাকরী পেল কিনা অনুপমদা? কিন্তু না, পরক্ষণেই সংকোচ আসে কণার, মা আবার যদি কিছু ভেবে বসেন?

বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে কণার, সামনের এই আষাঢ়েই। ওর বর নিজেই এসেছিল ওকে দেখতে, নিজেই পছন্দ করে গেছে। বিদ্বান ও বিলাত-ফেরৎ সে,—স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর।

আজকাল ওর খুব ভালো লাগে সেই সব কথা ভাবতে। জানালার পাশে মধ্যাহ্নের আকাশে মেঘের লীলা চলেছে, হাওয়ায় দুলছে নারকেলগাছটা! আর ঠিক সেই সময়, মোটর ছুটেছে, হু-হু করে আসছে হাওয়া। উঃ! এতো জোরে ছুটেছে গাড়ীটা! হাওয়া লেগে চোখ জ্বালা করে উঠছে। হাওয়ায়-ওড়া আঁচলটা চোখে চেপে ধরে কণা পাশের দিকে মুখ ফেরায়। আস্তে আস্তে বলে,—এই, করছ কী তুমি? এতো জোরে বুঝি গাড়ী চালায়?

মোটর যে চালাচ্ছিল, সে এবার কণার দিকে মুখ ফেরালো। অবিকল সেই দেখতে-আসা বরের সুন্দর মুখখানা। ওর দিকে তাকিয়ে তেমনি মিটিমিটি হাসছে সে, কথা বলছে না। কণা সরে আসে লোকটির খুব কাছে, বলে,—বড়ো দুষ্টু তুমি, এতো জোরে গাড়ী চালাচ্ছ, ভয় করে না আমার?

গাড়ী থেমে যায় পরক্ষণেই। লোকটি সেই রকম দুষ্টু হাসি হাসতে হাসতেই ওর দিকে ঝুঁকে একেবার ওর মুখের ওপর...।

—ধ্যেৎ, কণা এক ঝটকায় সরে যায়, কেউ যদি এখন দেখে ফেলে, তাহলে? কণা জোর করে অন্যদিকে মুখ ফেরায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে—ওমা, এ-কে? এযে অনুপমদা! মুখখানা ম্লান, চোখ দুটি ছলোছলো!

—অনুপমদা? কী ব্যাপার?—কণা মোটর থেকে ফুটপাথে নেমে দাঁড়ায়, পিছন পিছন এসে দাঁড়ায় ওর বর। তার দিকে ফিরে কণা অনুপমদাকে দেখিয়ে বলে,—ওগো, একে চেনো তুমি? আমাদের অনুপমদা!

—ও।

এবার অনুপমদার কাছে সরে আসে কণা, বলে,—কেমন অনুপমদা?

কোনো উত্তর সে দেয় না অনুপম, ম্লান একটু হাসে শুধু। বচারী অনুপমদা!

বরের দিকে আবার তাকায় কণা, বলে,—ওগো, শুনছ? ামার ত অনেক বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে আলাপ, দাও না নুপমদাকে একটা চাকরী ঠিক করে, বড়ো গরীব অনুপমদা।

ভদ্রলোক বলেন,—বেশ ত, আপনি একবার আমার সঙ্গে দেখা রবেন। আমি চেষ্টা করব!

কৃতজ্ঞতায় অনুপমের চোখ যেন আরো ছলছলিয়ে ওঠে।

আবার ছোটে মোটর। আবার তেমনি বাতাস আসে হু করে, কণার ঘোমটাটা খালি খুলে খুলে যায়। আবার বলে া—এই আস্তে।

হাসি হেসে ভদ্রলোক ওর হাত চেপে ধরেন। কণা বার ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ছাড়াবে সাধ্য কার? লোহার মতো শক্ত হাত! এবার সত্যিই হাতটায় ব্যথা করে রে!

ঘুম ভেঙ্গে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে জেগে ওঠে কণা।

ঈস, বেলা যে এদিকে গড়িয়ে গেল,—দেয়ালের বড়ো ঘড়ীর কাঁটাটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আচ্ছা ঘুমই সে দিয়েছে যাহোক। আর হাতটা খাটের বাজুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে যা ভয়ানক ব্যথা করছে!

মা এসে ঘরে ঢোকে। কণা ততক্ষণে খাট ছেড়ে মেঝের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

—কী রে, ঘুমোচ্ছিলি নাকি ?—

—হ্যাঁ মা, হঠাৎ আজ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মা ততক্ষণে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়েছে। একটু দম নিয়ে বলে—বাব্বাঃ! ওদের বাড়িটা যা দূর!

—কাদের বাড়ি ?

—অনুপমদের,—হেঁটে আসতে গিয়ে পা-টা ধরে গেছে একেবারে।

—আহা, ভারী ত দূর, এখান থেকে ঐটুকু।

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমাদের মতো বুড়ী হয়ে নে, তখন ঐটুকু পথই হেঁটে দেখিস।

কণা একটু হাসে, বলে,—আজ যে আবার হঠাৎ ওদের বাড়ি গিয়েছিলে ?

—হঠাৎ কী রে ? অনুপমরা কী আমাদের পর ?

তারপরে একটু থেমে মা আবার বলে—ভালো কথা কণা শুনেছিস ?

—কী, মা ?

—সামনের শুক্রবার অনুপমের যে বিয়ে।

কণা যেন আকাশ থেকে পড়ে,—বিয়ে!

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।—খুব ভালো হলো। সোনার চাঁদ ছে অনুপম, কর্মী ছেলে। ভালো চাকরী পেয়েছে। আর বউটি হবে নাকি খুব সুন্দরী, ফর্সা টুকটুকে রঙ্!......

তারপর, কয়েকটা দিন ধরে মা ও মেয়ের মধ্যে চলেছিল সে এক প্রচণ্ড মান-অভিমানের পালা। মেয়ে বেঁকে বসল, বিয়ে সে করবে না, পড়বে। বাবা এসে বোঝালেন, মা এসে বোঝালেন, কিন্তু কে-টলাবে কণাকে? আর, ওদিকেও ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা, হঠাৎই বিয়ে পিছিয়ে গেল অনুপমের। সেই খুব সুন্দরী ফরসা টুকটুকে রঙ কনেটির নাকি অসুখ হয়েছে। প্রবল জ্বর, ডাক্তার বলছেন, টাইফয়েডে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

সবই শুনত কণিকা মায়ের কাছ থেকে। অনুপম কখনো আসত না তাদের বাড়ি, সে-ও যেতো না ওদের ওখানে। মা-ই শুধু যোগাযোগটা রেখেছিলেন।

মা একদিন বললেন—অনুপম যে অমন চাকরীটি পেয়েছে, তার পিছনে ওর ভাবী শ্বশুরের হাত আছে। মেয়ে সেরে উঠলে ও-বিয়ে তাকে করতেই হবে।

মাকে প্রশ্ন করে কণিকা—কেমন আছে মেয়েটি?

—কেমন আবার! যমে মানুষে টানাটানি চলছিল, এখন একটু সামলে উঠেছে!

—কোথায় থাকে ওরা?

মা বললেন—কারা? অনুপমের ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ী?—বালিগঞ্জ। বেশ বড়োলোক ওরা। ও-ই বড়ো মেয়ে, তারপরে সব ছোট ছোট ভাইবোন।

আর কোনো কথা হয় না। কিন্তু, ওদিকে আরেকটা ভালো সম্বন্ধ আসে কণিকার। আবার যুদ্ধ চলে। কণিকা রাগ করে বলে—অমন যদি করো, আমি বাড়ি ছেড়ে জ্যেঠামশায়ের কাছে চলে যাবো।

কণিকার একমাত্র নিঃসন্তান জ্যেঠামশাই রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন কার্মাটাড়ে। কখনো কলকাতায় আসেন না, কালে-চন্দ্রে চিঠিপত্র আসে দু' একখানা। তাতে, কণাকে দিন কয়েকের জন্যে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবারও অনুরোধ থাকে।

থাকে বটে, কিন্তু কখনো যাওয়া হয়নি কণার। জ্যেঠাইমার কথা মনেই পড়েনা, জ্যেঠামশায়ের গম্ভীর মুখখানা একটু একটু মনে পড়ে শুধু!

তবু, মার কাছে অভিমান করে যখন সে কিছু বলত, তখন তার কথার মাত্রা ছিল ঐ, অমন যদি করো ত, কার্মাটাড়ে চলে যাবো জ্যেঠামশায়ের কাছে!

মা বলতেন—যাওনা একবার! খেতে পাবে না! যা কিপ্টে! নাম করলে হাঁড়ি ফাটে!

—আমার জ্যেঠামশায়ের সম্বন্ধে যা-তা বোলো না বলছি! নাম করা উকিল ছিলেন না এককালে?

মা আর কিছু বলতেন না, মুখ টিপে টিপে হাসতেন

কিন্তু, এসব কথা যখন মা-মেয়েতে চলছিল, তখন কি ওরা দুজনের একজনও কেউ জানতেন যে, যা ওঁরা ঠাট্টাচ্ছলে বলাবলি করছেন, তা-ই সত্যি হয়ে দাঁড়াবে এবং অচিরেই তা হবে!

মা একদিন বললেন—তোর মনের ইচ্ছাটা কী, খুলে বল দেখি? না হয়, চোখকাণ বুজে অনুপমের সঙ্গেই সম্বন্ধ করি?

—ছি-ছি!—বলে, তাড়াতাড়ি মার কাছে থেকে ছুটে পালালো কণা।

কণার মায়ের বহুদিনের পুষে-রাখা একটা অসুখ ছিল, যাকে ওরা বলত ফিক্‌ব্যথা। বুক-পিঠ হঠাৎ ব্যথা করে উঠত, তখন একটা মলম দিয়ে বেশ করে মালিশ করতে হতো।

এর পরে, আরেকদিন যখন মা ওদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসে 'বুকে ব্যথা-বুকে ব্যথা' বলে হঠাৎ বসে পড়লেন, তখন সেটাকে মার ঐ পুরাণো অসুখ মনে করেই, শশব্যস্তে মার বুকে-পিঠে মলম মালিশ করতে লাগল কণা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে, একটু সুস্থ বোধ করে কথা বলতে

লাগলেন মা। বললেন—কণা, অনুপম ভাবী বউ আর শাশুড়ীর সঙ্গে ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাচ্ছে।

—ভালো হয়ে উঠেছে মেয়েটা ?

—হ্যাঁ। কিন্তু, খুব দুর্বল, তাই ডাক্তারের কথায় চেঞ্জে যাচ্ছে।

—কোথায় ?

একটুক্ষণ চুপ করে কী সব ভাবলেন মা, তারপরে বললেন—ঐ যাঃ, জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলাম।

—তা বেশ করেছ, এখন চুপ করে শুয়ে থাকো দেখি। অফিস থেকে বাবার ফিরবার সময় হলো।

মা চুপ করলেন বটে, কিন্তু দুটি চোখ তাঁর হঠাৎ জলে ভরে উঠল।

আশ্চর্য হয়ে কণা বললে—একী, কাঁদছ কেন ?

ওর হাতটা বুকের ওপরে টেনে নিয়ে মা বললেন—হলো না মা। আজ আমি অনুপমের মার কাছে কথাটা পেড়েছিলাম। তাকে দোষ দেবো কি, আমারই দোষ। আমি যদি আগে তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতাম!

—কী মা, কী বলছ ?

মা কথাগুলি বলে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন—অনুপমের মা বললে,—আর তা কী করে হয়, দিদি ? এখানে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তার ওপরে ঐ মেয়ের জন্যই আমার ছেলের চাকরী!

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝতে পারল কণা, লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে ক্ষোভে সে বলে উঠল—একী করলে মা, কাঙালের মতো ওদের কাছে সাধতে গেলে!

মা বললেন—কী আর করি বল! তোর মুখ চেয়ে সবই করতে হলো।

—ছি-ছি!—দু'হাতে মুখ ঢাকলো কণা।

মা বললেন—কেন যে তুই বিয়ে করতে চাস না, আমি কি মা হয়ে তা বুঝি না?

কণা এতক্ষণে কেঁদে ফেললে ঝর্‌ঝর করে, বললে—আমি তোমার সব কথা শুনব মা। তোমার যা খুসী, এবার তাই করো।

সত্যি কথা বলতে কী, পরে মনে হয়েছিল কণার, মা বুঝি তারই কথা রাখতে যা-খুসী তা-ই করলেন। বাবা কতো ডাক্তার আনলেন, কতো কী ব্যবস্থা হলো, কিন্তু ঐ যে বিছানা নিয়েছিলেন তিনি, আর উঠলেন না। রোগটা কী ভালো করে বুঝতে-না-বুঝতেই তিনি চলে গেলেন!

বড়ো ডাক্তার বলেছিলেন—হৃদ্‌রোগ। কিন্তু কণার মনে হয়েছিল, তার ওপর অভিমান করেই বুঝি চলে গেলেন তার মা। মনে হতে লাগল, সব যেন শূন্য হয়ে গেছে! সারা কলকাতা শহরটা যেন তাকে চারদিক থেকে এসে পিষে ফেলতে চাইছে!

যথারীতি শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে যাবার পর আবার সব যখন একটু শান্ত হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ একদিন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কণার প্রাণটা হু-হু করে উঠল। কয়েকদিনের মধ্যে একটা মানুষ যে এমন করে দেহে-মনে ভেঙে পড়তে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না!

—বাবা!

বাবা বললেন—মা, আমি দীর্ঘকালের ছুটি নিয়েছি। মন করেছি, হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবো কিছুদিন। তুমি কার্মাটাড়ে, তোমার জ্যেঠামশায়ের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে পারবে না? আমি এ বাড়ির সবটাই ভাড়া দিয়ে দেবো ভাবছি।

—তাই হবে বাবা।

তা-ই হলো। তার বাবা তাকে কার্মাটাড়ে, জ্যেঠামশায়ের

কাছে পৌঁছে দিয়ে আর, ছোট ভাই দুটিকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিয়ে, চলে গেলেন হিমালয়ের দিকে। ফলে সে হলো বন্দিনী জ্যেঠামশায়ের বিরাট বাড়িটার মধ্যে! বিকৃত মস্তিষ্ক অদ্ভুত প্রাণী তার ঐ জ্যেঠাইমা, আর কঠিন—কঠোর প্রাণ তার জ্যেঠামশাই! এ এক আশ্চর্য পরিস্থিতিতেই এসে সেদিন পড়েছিল কণিকা!

কিন্তু কণিকার কথা বাকীটুকু বলবার আগে অনুপমের কাহিনী এবার বলা দরকার।

টাইফয়েড থেকে উঠেছে আদরের মেয়ে শোভা, তার মন বুঝে ওঁদের ভাবী জামাই অনুপমকেও ওঁরা সঙ্গে নিলেন। কথা হলো, শ্বশুরমশাই ওদের পৌঁছে দিয়ে, দিনকতক থেকেই চলে আসবেন অফিস সামলাতে, আর অনুপম থেকে যাবে ওখানে, ভাবী শাশুড়ীর সংসারে।

মেয়ের নাম শোভা, আর মায়ের নাম সুলতা।

দূরে দূরে পাহাড়ের আভাষ দেখা যায়। যায়গাটা নির্জন অন্ততঃ কলকাতার মতো কর্মমুখর নয়। যে বাড়িতে তারা থাকতে এসেছে, সেটি বাংলো প্যাটার্ণের পুরানো বাড়ি, চারিদিক বাগান দিয়ে ঘেরা।

পুরানো বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধুলো জমেছে। সমস্ত রঙ—সমস্ত উজ্জ্বলতা—সমস্ত প্রখরতা, বিদায় নিয়ে গেছে বহুদিন। মলিন বিবর্ণ অতীতের স্মৃতি-আকীর্ণ পথপ্রান্তেই বুঝি এতোকাল পরে পা ফেলেছেন সুলতা!

চারদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনটা কেমন উদাস হয়ে যেতে চায়, সত্যিই মন চলে যেতে চায় সুদূর অতীতে।

দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। একটা গাছের মাথায় পাখীর দল এসে জটলা করছে। একটি সাওতাল ছেলে বাঁশী বাজাতে বাজাতে পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তার পিছনে

পিছনে তরুণী একটি মেয়ে, খুব হাসিখুসী, খোঁপায় সাদা সাদা ফুলের গুচ্ছ সাজানো।

—মা, ওমা, কোথায় তুমি ?

চমকে উঠে মুখ ফেরালেন সুলতা,—কে ডাকছে ? শোভা ? দূর থেকে যেন শোভারই গলা পেলেন তিনি।

—মা, তুমি এখানে ? আমি খুঁজে খুঁজে মরছি।

—কাছে আয়।

—যায়গাটা কী সুন্দর, না মা ?

মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সুলতা বললেন,—ট্রেণ থেকে নেমেই ছুটোপাটি করতে বেরিয়েছিলি ত ? অনুপম কোথায় ? কী করছে সে ?

—জানি না। কে কী করছে না করছে সেজন্য তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন ?

—বলিস কী! পরের ছেলেকে সঙ্গে এনেছি, মাথাব্যথা হবে না ?

—ঈস্, ভারী আমার পরের ছেলে! জানো মা, ঐ যে টিবিটা দেখছ, ওর কাছে যেতে যেতে আমার সঙ্গে কী তর্ক! এখন আবার এসে পিছনের বাগানে পুকুরধারে একা একা বসে বসে কবিত্ব ফলানো হচ্ছে!

মা হাসলেন। শাড়ীর আঁচলটা ঠিক করে নিতে নিতে শোভা বলল,—মা, বাবা কোথায় ? ছবি, ভোম্বল—ওরাই বা গেল কোথায় ? বেরিয়েছে বুঝি ? বাব্বাঃ, ট্রেণ থেকে নেমেই বেড়ানো,—বাবার যেমন কাণ্ড!

—কার বাবা দেখতে হবে ত ?

শোভা হঠাৎ একেবারে শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠল,—মা, দেখ দেখ, কী রকম হলদে হলদে ফুল! কী রকম বুনো বুনো মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ!

—ওটা কী জানিস? মহুয়া।

—এই মহুয়া!······

তরুণ উজ্জ্বল মনপ্রাণ নিয়ে শোভা ঝলমল করে উঠল। দূরে দূরে দেখা যায়, শালের শিরে শিরে বসন্ত নেমেছে, বসন্ত নেমেছে অরণ্যে অরণ্যে।

আরেকটু এগিয়ে এলেন সুলতা। ফটকের মাথায়-মাথায় এককালে যে কারুকার্য ছিল এখন তা নেই, শুধু চূণবালি-খসা ইটের নির্লজ্জ কঙ্কাল দেখা দিয়েছে। এরই একপাশে একখণ্ড পাথরের ফলকে এক জনের নাম ছিল স্বাক্ষরিত।

বুকের ভিতর থেকে আপনিই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, সুলতা অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে,—না, নামটা নেই।

—কার নাম, মা?

সুলতা বললেন—এই বাড়ি যাঁর।

শোভা একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল—এই বাড়ি তাহলে আমাদের নয়! তবে যে বাবা···।

—ঠিকই বলেছেন। সুলতা বলেন—এই বাড়ি এখন আমার। বাড়ির মালিক মৃত্যুকালে উইল করে এটা আমাকে দান করে গেছেন।

—কে মা তিনি? বলো না তাঁর নাম?

ম্লান একটা ছায়া যেন মুহূর্তের জন্য এসে পড়ল সুলতার মুখে, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সামলে নিয়ে হেসে উঠলেন সুলতা, বললেন,—সবে ত মাটিতে পা দিয়েছিস, এরই মধ্যে সব শুনে নিতে চাস? পরে বলব।

বুড়ো আমগাছটার পাতায় পাতায় পথের ধূলো এসে জমেছে। তারই নীচ দিয়ে চলতে চলতে সুলতা বললেন—তুই যা শোভা, দেখ গিয়ে অনুপম কী করছে।

—যাচ্ছি গো যাচ্ছি, আমাকে তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচো তোমরা!

শোভা ছুটল। সুলতা ধীর পায়ে এসে বারান্দায় উঠলেন।

অরণ্যের স্বপ্নকে ভেঙে জনপদ গড়ে উঠছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িও হয়ে উঠছে জরাজীর্ণ। এখানে যথেচ্ছ জঙ্গল। রান্না-ঘরের মাথায় অশ্বথ-শিশু। ছাদের কার্ণিশ প্রায় খসে গেছে, দেয়ালের প্রায় সবটাই নোনা-পড়া। মেঝের সিমেন্ট প্রায়শই উঠে গেছে, পায়ের তলায় মেঝেটা কর্কশ।

অনেক কষ্টের পর কাজ চালানো গোছের পরিষ্কার করে নিতে পারা গেল খান কয়েক ঘর। শুধু চাকর বাকরের দ্বারা কী হয়? নিজেকেও খাটতে হয়েছে সুলতা দেবীর। তাও কালকের জন্য অনেক কাজ পড়ে রইল। আজকে ট্রেণ থেকে নেমে আজকেই সব কিছু গুছিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

দরজা ঠেলে একটা ঘরে ঢুকলেন সুলতা। ছোট পুরাণো আলমারী কয়েকটা, স্তূপীকৃত বই তার মধ্যে। আলমারীর কাঁচগুলি বেশীর ভাগই ভেঙে গেছে। ইঁদুরেরা যথেচ্ছাচারে বইগুলো কেটেছে। একটা বইও পুরোপুরি আস্ত নেই। তার ওপর ধূলো,—এত ধূলোও থাকতে পারে এ রাজ্যে!

টেবিলে এলোমেলো ইঁদুরে ছড়ানো একরাশ কাগজ-পত্র আর বই। ঘরের কোণে-কোণে ঝুল, মাকড়সার জাল। এ ঘরটা আজ আর পরিষ্কার করা হল না, কিন্তু করা উচিত ছিল।

অনেক চেষ্টার পর দক্ষিণের জানালার একটা পাল্লা খুলে ফেললেন সুলতা। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। দুটো-একটা তারাও ফুটছে। আকাশের কোণে থমকে আছে একরাশ লঘু মেঘ। পাখীর কাকলী স্তব্ধ হয়ে এলো। দেখতে দেখতে নামল সন্ধ্যা। ঘরের ছায়া কালো হয়ে গেল, নোনা-ধরা দেওয়াল-গুলি দেখাতে লাগল বিচিত্র, টেবিল চেয়ার আলমারী—সবই যেন ভরে উঠল নিদারুণ রহস্যে!

এ জগতের খবর যেন জানা নেই, এ বৈচিত্র্যের সঙ্গে যেন

পরিচয় নেই—এ এক সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত তিমিরমগ্ন পরিবেশ।

—লক্ষ্মণ-লক্ষ্মণ!—ডেকে উঠলেন সুলতা।

—যাই মা।

—কী করছিস? একটা আলো দিয়ে যা এঘরে।

—যাই।

ঘন হচ্ছে অন্ধকার। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে বাইরে। ঘরের মধ্যে একটা চামচিকে উড়ে এসে খানিকক্ষণ চক্কোর দিয়ে, জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

—কইরে লক্ষ্মণ, আলো দিয়ে গেলি?

—এই, যাচ্ছি।

একটু পরেই লক্ষ্মণ এলো আলো হাতে। আলোটা রাখতে রাখতে বলল,—মা, বাবু খুঁজছেন আপনাকে।

—এসেছেন এতক্ষণে?

বলতে না বলতেই সকন্যক সপুত্র সদাশিববাবু প্রবেশ করলেন। সব থেকে ছোট মেয়েটি, যার নাম ছবি, বয়স বছর সাত-আট, সবুজ রঙের ফ্রক পরা, ছোট্ট দুটি মুঠি দিয়ে ওঁর ডানহাতখানা ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতেই এলো। পিছনে পিছনে হাফ প্যাণ্ট ও সার্ট পরা অশোক আর আনন্দ, বারো এবং দশ বছর বয়স হবে ওদের।

—রামো-রামো, এই ঘরের মধ্যে ঢুকে চুপচাপ বসে আছ? ঈস্, কী ধূলো আর ময়লা রে বাবা!

ঝংকার দিয়ে উঠলেন সুলতা,—কে আসতে বলল তোমাকে এ ঘরে?

একটা চেয়ার টেনে ধূলো মুছে ততক্ষণে বসে পড়তে পড়তে সদাশিববাবু বললেন,—গরজে ঢেলা বয়! বিছানা পেতে সাজিয়ে রেখেছ বটে, কিন্তু দেখেছ তার অবস্থা? ভদ্রলোক শুতে পারে? এখন ব্যবস্থা একটা করো? যে ধূলো উড়ে বেড়াচ্ছে, বাপ্‌স্!

—এই ছবি! বইগুলি হাঁটকাস নি, ছিঁড়ে ফেলবি। আঃ, এই

অশোক! দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াচ্ছিস, জামাটা ময়লা হয়ে যাবে যে! আনন্দ! এদিকে আয়। একী, চুলগুলি এলেমেলো করলি কী করে?

ছবি বাবার কোলে জাঁকিয়ে বসেছে ততক্ষণে, বলল,—আমরা কতো বেড়ালাম, না বাবা? মা ভীষণ বোকা, বেড়াতে পেলো না, কী মজা!

—ঠিক কথাই ত—সদাশিববাবু হেসে উঠলেন,—বোকা নইলে কেউ অমন হাঁড়িমুখো হয়ে বসে থাকে!

—খুব হয়েছে! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেপিলেগুলোর মাথা খেলেন একেবারে! ছেড়ে দাও ওদের, খাইয়ে আনি, এখ্খুনি ঘুমিয়ে পড়বে। অশোক, দেখ ত বাবা, তোর দিদি আর অনুপমদা কোথায়! ডেকে নিয়ে আয়, খেয়ে নিক। নাও, ওঠো দেখি। এই ছবি, নাম কোল থেকে!

—উঁহু!—সদাশিববাবু বললেন,—পাদমেকং ন গচ্ছামি। জল-হাওয়ার গুণে ভাব-টাব আসতে পারে ত? গোল করো না, ভাব আসছে!

বাপের চিবুক ধরে ছবি বলে ওঠে,—বাবা, ভাব কী?

—অনেকটা ডাব বলা যায়। বাইরে কিছু নেই, ভিতরে টলমল করছে সুস্বাদু পানীয়।

হেসে ফেললেন স্নুলতাদেবী—বয়সের গাছপাথর নেই তবু ছেলেমি গেল না! এই আনন্দ, কোথায় যাচ্ছিস?

—দাদা ডাকছে।—বলে, আনন্দ পালালো অশোকের পিছনে।

—নাও, ওঠো শীগগির, আলো নিয়ে চললাম।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে পড়লেন সদাশিববাবু, বললেন,—আয়রে ছবি, ফাঁসীর হুকুম হয়েছে!

—ঢং,—স্নুলতা এগিয়ে চললেন,—মেয়ে বড়ো হয়েছে, দু'দিন বাদে জামাই আসবে, এখনো হুঁস নেই!

—জামাই আসবে কি গো! এসে বসে আছে বলো। অনুপম বেচারী তোমার আর তোমার মেয়ের পাল্লায় পড়ে......

—আঃ, হচ্ছে কী!—চাপা গলায় একরকম ধমকেই উঠলেন সুলতা,—ঐ ওরা আসছে, শুনতে পাবে যে!

কিন্তু শুনতে ওরা পায় নি। জলতরঙ্গের একটা যেন ঝংকার তুলে শোভা অনুপমের আগে আগে ছুটে এসে বলল,—মা, শোনো অনুপমদার কথা! এখানকার পাথর নাকি কথা কয়, পাথরের নাকি ভাষা আছে!—

বলেই, সে হাসতে লাগল উচ্ছ্বসিত হয়ে।

রাত তখন অনেক। ঘুম আসছে না সুলতা দেবীর। পাশেই ঘুমিয়ে আছে ছবি। ওপাশে আনন্দ, তারপরে সদাশিববাবু। এপাশে সুলতার কোল ঘেঁসে শোভা। পাশের ঘরে শুয়েছে অশোক আর অনুপম। অন্য ঘরে ঠাকুর আর চাকররা।

ভালো লাগছে না সুলতা দেবীর। মনে হচ্ছে, ট্রেণের দোলাটা এখনো ওঁর মস্তিষ্কের কোষে-কোষে রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্—একটানা ক্লান্ত সুর তুলে চলেছে! বাইরের বাগানে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না, জানালার ফাঁকে ফাঁকে তারই আভাস। বাইরে থেকে ভেসে আসছে কাঁঠালী চাঁপার গন্ধ!

পাশ ফিরতেই শোভার গায়ে হাতটা হঠাৎ ঠেকে গেল। আহা, কী হাত-পা ছড়িয়েই না শুয়ে আছে মেয়েটা! বড়ো হচ্ছে আর ধিঙ্গিপনা বাড়ছে! ভাবতে ভাবতে হঠাৎই দুর্বোধ্য এক অকারণ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন সুলতা। তীব্র বিদ্বেষে মেয়ের দিকে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতেই উঠে পড়লেন তিনি। হাত বাড়িয়ে কমিয়ে দেওয়া লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে দিলেন একটু। তারপরে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুললেন—সেই ধূলি-ম্লান

বিবর্ণ-বইয়ের ঘর!

কবাটটা ভেজিয়ে দিয়ে আলো হাতে ভিতরে এলেন সুলতা দেবী।

এধারে বই—ওধারে বই, চারিদিকে বই আর বই! একটা পৈত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা যেন তার দিকে তাকিয়ে নিদারুণ বিস্ময়ে নিঝুম হয়ে বসে আছে! কাদের নির্বাক জটলায় বিঘ্ন ঘটেছে যেন, চাপা অসন্তোষে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল যেন কারা, কারা যেন অস্ফুট গুঞ্জন তুলে বলতে লাগল—অনধিকার প্রবেশ করেছ, এ তোমার অধিকারের সম্পূর্ণ বাইরে!

হঠাৎই হাতে লেগে ধপ করে একটা বই পড়ে গেল মেঝের ওপরে। আর সেই অতর্কিত শব্দটুকুতেই আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন সুলতা। কে! কে!

কেউই না। পড়ে যাওয়া বইটা হাতের ওপর তুলে নিলেন তিনি। সম্ভবতঃ ব্রাউনিঙ্‌। , বইখানার ভাঁজে ছোট্ট একটা ময়লা কাগজ, মেয়েলী হাতের বাঁকা অক্ষরে বাঙলায় লেখা,—তোমাকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি!······

লেখাটা আরেকবার পড়লেন সুলতা। একবার কেন তারপরে আরও বারকতক। পড়তে পড়তে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতে লাগলেন তিনি—চিনতে পারো সুলতা, এ লেখা কার?

—'এ লেখা তোমার!'—তাঁর ভিতর থেকে অতীতের এক সুলতা যেন হঠাৎ উঁকি দিয়ে বললে—'এ তোমারই লেখা। তোমার সেই বয়ঃসন্ধিকালের কথা স্মরণ করো, সেই প্রথম যৌবনের কথা। একটি তরুণ তোমাদের বাড়িতে আসত, তোমার দাদার সহপাঠী, মনে পড়ে? মনে পড়ে তার কথা, যার বাড়িতে আজ তুমি পা ফেলেছো?'

সুলতার এতক্ষণে মনে হলো, অতীতের কোন্ প্রেত যেন হঠাৎ আজকের এই সুলতা-সত্ত্বার কণ্ঠনালী প্রাণপণে চেপে ধরেছে,

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, চোখে আসছে অন্ধকার ঘনিয়ে, শরীরের সমস্ত শোণিত চলাচল বুঝি মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেছে!

আর, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক শোভার মতো দেখতে, ঠিক শোভারই বয়সী এক নতুন সুলতা তাঁর এই পুরাতন দেহ-বল্লরী থেকে উঠে এসে দাঁড়ালো একেবারে তাঁর মুখোমুখি হয়ে। ঠোঁটে শোভার মতোই বাঁকা হাসি, চোখের কোণে শোভার মতোই তারুণ্যের উজ্জ্বলতা, কলকণ্ঠে বললে—'চিনতে পারো? যে সুলতাকে তুমি বহু বছর আগে অতীতকালের পথপ্রান্তে ফেলে এসেছ, আমিই সেই সুলতা। আমিই লিখেছিলাম ঐ বইয়ের পৃষ্ঠায় ঐ কথাটা,— 'আমি তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করি!'

'কাকে ঘৃণা করি?'—যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন সুলতা, সোজা হয়ে বসলেন, হাতে ব্রাউনিঙের সেই বইখানা!

ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ী পরতে শুরু করেছে সুলতা, এমন সময় দাদার সেই বন্ধু,—মানসবাবু, মানসদা—হঠাৎ মনোযোগী হয়ে উঠলেন তার ওপরে। নিজে থেকেই তার পড়ার টেবিলে এসে বসতে আরম্ভ করলেন, নিজে থেকেই বললেন একদিন—'আমি তোমাকে পড়াবো।'

খুব যত্ন করেই পড়াতেন। ভালোই লাগত মানসদাকে, খুব ভালো লাগত। এক একদিন একটু দেরী করে এলে মন খারাপ হয়ে যেতো সুলতার। কিন্তু, সেই মানসদাই হঠাৎ একদিন যখন তার হাতখানা চেপে ধরেছিল, তখন ভয়ে আতঙ্কে ওর মনে হচ্ছিল, বুঝি ঐ মুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে সে!

পরদিন হাতের সেই বইখানার মধ্যে একটি কাগজ লুকিয়ে রেখে বইখানা তার হাতে দিলেন মানসদা। বইটা খুলতেই কাগজটা চোখে পড়েছিল সুলতার! তখন কৌতূহলী হয়েই কাগজটা পড়েছিল সে, তাতে লেখা ছিল,—'আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সুলতা!'

মুহূর্তে বুঝি উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল সে! নইলে, বইখানার পাতায় অমন করে তখ্‌খুনি সে লিখতে গেল কেন,—'তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করি!'

বিরস মুখে বইখানা হাতে করে সেই যে চলে গেল মানসদা, আর তাকে পড়াতে আসে নি কোনোদিন। পরে কয়েকটা দিন লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল সুলতা, কিন্তু সেই কান্নার খবর কেউ জানে না!

বয়ঃসন্ধিকাল, তা সে পুরুষেরই হোক কি মেয়েরই হোক, বড়ো আশ্চর্য সব মুহূর্ত দিয়ে ভরা! কে যে কখন কী করে ফেলবে, তা সে নিজেই জানে না!—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না!'—কিম্বা, তখন হঠাৎ কিছু পেতেও ভয় করে, হঠাৎ কিছু দিতেও ভয় করে!

নিজের মনেই ভেবে চলেছেন সুলতা দেবী,—আজকের মেয়েরা বরং অনেক সচেতন হয়েছে, শোভার সঙ্গে সেদিনকার সুলতার তফাৎ হচ্ছে এইখানে। আজকের শোভাদের মানসিক দ্বন্দ্ব বোধহয় সেদিনকার সুলতাদের মতো নয়!

তফাৎ অনুপমদের সঙ্গে মানসদেরও আছে। আজকালকার ছেলে হলে কী হতো জানি না,—সুলতা ভাবতে লাগলেন—কিন্তু সেদিনকার ছেলে বলেই মানস যা করতে পেরেছিল, তা এক আশ্চর্য ঘটনা!

তার বিয়ের দিনে মানস এসেছিল দুপুরের দিকে। এলোচুল, কোরা একখানা শাড়ী ওর পরণে, হাতে একটা হলদে সুতো বাঁধা, মানস ওকে দেখে বলে উঠেছিল—'বারে, দেখাচ্ছে ত চমৎকার!'

ওর সামনে সেদিন দাঁড়িয়ে থাকা কী সহজ কথা! এঁকে বেঁকে ওর পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে ছুটে চলে এসেছিল সুলতা, আর মনে মনে প্রার্থনা করেছিল—'ভগবান ও যেন আমার সামনে এসে আর না দাঁড়ায়!

না, আর সে আসে নি।

দিন যায়, সংসারে কতো পরিবর্তনই না আসে! মানসদার খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যেতো তার দাদার কাছে। একদিন শুনল, কোন দূর দেশে প্রফেসারী নিয়ে চলে গেছে মানসদা।

এমনি করে করে দিন গেল, বছরের পর বছর পার হয়ে গেল। সংসারে কতো আশ্চর্য কাণ্ডই না ঘটল! একে একে শোভা এলো, অশোক এলো, আনন্দ এলো এবং ওর স্বামীর বন্ধু সুব্রতবাবুরও সন্ধান পাওয়া গেল। সন্ধান পাওঁয়া গেল সুব্রতবাবুর ছেলে অনুপমেরও। কী যে খেয়াল হলো ওঁর, খেয়ালের বশেই একদিন বললেন—বড়ো ভালো ছেলে গো, ওর সঙ্গেই শোভার সম্বন্ধ করি, কী বলো?

শুধু সম্বন্ধ নয়, নিজে তদ্বির করে বন্ধু-পুত্রের ভালো চাকরীও করে দিলেন তিনি। তার পরে, শোভার হলো অসুখ, বিয়ে গেল পিছিয়ে।

কিন্তু তা যাক, অনুপমকে দেখে, ওর সঙ্গে কথা বলে, সুলতারও বেশ ভালো লেগেছিল ছেলেটিকে। বয়স আন্দাজে ধীর, গম্ভীর। কোনো বাচালতা নেই কিছু নেই, সত্যিই ভালো ছেলে।

কিছু না ভেবেই একদিন অনুপমকে বললেন সুলতা—চলো না অনুপম, আমাদের সঙ্গে কার্মাটাড়ে।

একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে, মুখ নীচু করেই উত্তর দিয়েছিল,—কিন্তু, ছুটি?

—সে তুমি ভাবছ কেন? সেসব ব্যবস্থা উনিই করে দেবেন।

ভদ্রলোক প্রথমটায় 'না-না, তা কী করে হবে, নতুন চাকরী' —এসব বললেও, সুলতার কাছে তাঁর সব আপত্তিই ভেসে গিয়েছিল। ঠিক হলো, উনি গিয়ে ওঁদের রেখে এসে অফিস সামলাবেন, দিন পনেরো পরে অনুপমও ফিরে আসবে। ফিরে

এসে দিন চার কাটিয়ে আবার যাবে এবং কাটিয়ে আসবে আরো দিন দশ-বারো। এর মধ্যে মেয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পাবে আশা করা যায়।

স্নুলতা মুখ টিপে হেসে বলেছিলেন—তা আশা করা যায়।

কিন্তু, এত যায়গা থাকতে বেছে বেছে কার্মাটাড়েই বা কেন? —মানসদার উইল? আজীবন অকৃতদার থেকে বই আর বই নিয়ে কাটিয়ে গেলেন মানসদা! কেউ কোথাও তেমন নিকট আত্মীয় ছিল না যে, ধরে বেঁধে বিয়ে দেবে। আর ধরা বাঁধা করলেই কি বিয়েতে রাজী হতো সে?

বুকের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে স্নুলতার! দিনে দিনে তিলে তিলে জীবনের একটা নির্মম সত্য অনুভব করেছিলেন তিনি। প্রথম প্রেমের আনন্দ হয়ত ভোলা যায় কিন্তু জীবনে কখনো যা ভোলা যায় না, সে হচ্ছে প্রথম প্রেমের বেদনা। প্রথম প্রেম ত আনন্দ হয়ে দেখা দেয় নি মানসদার জীবনে, বরং তীব্র এক হাহাকার নিয়েই দেখা দিয়েছিল! হায়রে, সেদিনের সেই স্নুলতা যদি এ'ভাবে বুঝতে পারত! তবে এমন একটা জীবন হয়ত অকালে এ ভাবে ঝরে পড়ত না!

চোখের জল আর বাধা মানল না, টপ টপ করে ঝরে পড়তে লাগল সেই 'তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করি'-র ওপরে, পড়ে পড়ে, 'ঘৃণা করি'কে ঝাপসা দুর্বোধ্য করে তুলতে লাগল।

মানসদা নাকি শেষের দিকে কার্মাটাড়ে এসে বই ছাড়া আর কিছুই জানত না! ফলে কঠিন রোগে, কসৌলী স্যানাটোরিয়ামে অকালে এভাবে এক অমূল্য জীবন! যাবার আগে—সাক্ষী রেখে সজ্ঞানে উইল করে গেল—"আমার যা কিছু আছে, সব স্থাবর আর সব অস্থাবর সম্পত্তি সেসব আমার অবর্তমানে পাবে আমার পূর্বতন ছাত্রী—"

হ্যাঁ; উইলে ছিলো স্নুলতারই নাম।

সুলতাই তার সব পেয়েছে!

কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, চীৎকার করে কেঁদে উঠবেন তিনি—কেন এত বড়ো শাস্তি তুমি আমাকে দিয়ে গেলে মানসদা!

যে কিছুই দেয়নি, সে পায় কোন্ অধিকারে?—

বইখানা রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন সুলতা। বাইরে, কেমন অদ্ভুত জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়েছে! কার চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাস এসে লাগছে তাঁর মুখে চোখে!

নিশুতি রাত, সবাই ঘুমুচ্ছে, আস্তে আস্তে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সুলতা।

এই বাড়িটার দক্ষিণ দিকে, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া আপন সীমানা নির্দেশ করছে, তার পাশ থেকে শুরু হয়েছে আরেক বাড়ির সীমান্ত। বাড়িটাও দেখা যায়, ইট বারকরা ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি। কিন্তু আসবার পর থেকে এখনও কাউকে তিনি দেখতে পাননি ও বাড়ির! শুধু, অশোক একবার উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসে বলেছিল—মা, দেখবে এসো? ও-বাড়িতে একটা ময়ূর আছে, খাঁচায় বন্ধ করা। বিরাট খাঁচা, একেবারে ঘরের মতন।

—ময়ূর?

—হ্যাঁ-মা, তবে পেখম ধরে নি। বৃষ্টি হলে ধরবে, না মা?

শোভা কথা বার্তা শুনে ছুটে এসেছিল, বলেছিল—এটা ত আষাঢ় মাস, যে কোনো মুহূর্তেই বৃষ্টি হতে পারে। এই অশোক, ময়ূর পেখম ধরলেই আমায় ডাকবি, বুঝলি?

বারান্দায় এসে এইসব কথাই ভাবছেন সুলতা, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, ঐ ইঁট বার করা বাড়িটার দোতলার একটা জানালায় আলো জ্বলছে! এতো রাত্রে আলো জ্বলছে কেন বাড়িটায়? কারা থাকে? কেমন তারা? রাত জেগে বই পড়ার নেশা ও বাড়িতেও কারুর আছে নাকি?

মনে মনেই উত্তর-প্রত্যুত্তর করতে করতে কয়েক পা এগিয়ে এসেছেন, হঠাৎ বারান্দার প্রান্তে কী লক্ষ্য করে নিদারুণ চমকে কেঁপে উঠলেন সুলতা! ভয়ও হলো। বারান্দার ধারে, ছায়ার মতো চুপচাপ কে অমনভাবে দাঁড়িয়ে! চাপা, ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—কে!

মূর্তিটি নড়ে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি।

যেন আবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন সুলতা, কণ্ঠস্বরে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন, বললেন—ও, তুমি!

তারপরে ধীর পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, বললেন—ঘুমোও নি?

—না, ঘুম আসছে না।

—রাত অনেক হলো কিন্তু।

—হ্যাঁ, এইবার যাচ্ছি।

মাথা নীচু করে ছেলেটি ধীরে ধীরে ফিরে গেল তাব ঘরের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সুলতার মনে জাগিয়ে রেখে গেল এক প্রশ্ন,—অনুপম কি শোভার সাহচর্যে সুখী নয়?

আজকালকার ছেলেমেয়েদের বোঝা ভার! তবুও ওদের যতটুকু তাঁর চোখে পড়েছে, তাই নিয়েই চিন্তা করতে লাগলেন' তিনি, নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় ফিরে এসে।

শোভা তেমনি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, কী বুঝি স্বপ্নও দেখছে। ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা! দেখতে দেখতে মনে হলো, প্রথম যৌবনের কাল, বয়ঃসন্ধির সীমানা পার-হওয়া আশ্চর্য মানসিকতার তোরণদ্বার এখনো পার হয়ে আসতে পারে নি শোভা! মনের ভুলে কোনো ভুল করে বসে ন ত মেয়েটা?

লক্ষ্য করেছে সুলতা, অনুপমকে শাসন করে বেড়াতে চায় শোভা।

—'ওখানে যাচ্ছেন কেন? না যেতে হবে না।'—'এ-জামাটা

পরেছেন কেন ? না, পাঞ্জাবীটা পরে আসুন।' ইত্যাদি, নানান্ শাসনের ঝড় !

নির্বিচারে তা পালন করে অনুপম, কিন্তু খুসী মনে করে কী ? বিরক্ত হয় না ত মনে মনে ?

এখানে এসে কী যেন বলেছিল শোভাকে ?—'পাথরে নাকি কথা কয় !'

হয়ত উচ্ছ্বাস আছে ছেলেটির মনে, এবং এ বয়সে উচ্ছ্বাসটা থাকা খুবই ভালো। কিন্তু, এ উচ্ছ্বাস শোভার কাছে প্রশ্রয় না পেয়ে ঝিমিয়ে পড়ছে না ত ?

কাল সকাল থেকে ব্যাপারটা একটু ভালো করেই লক্ষ্য করে দেখতে হবে !

পাশ ফিরলেন স্নুলতা। দু'চোখে এই এতক্ষণে ঘুম এসে নামতে চাইছে ! ঘুমিয়ে পড়বার মুহূর্তেও একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা হঠাৎ ছুঁয়ে গেল মনটাকে। মনে হলো,—আচ্ছা, ঐ ইট বার করা বাড়িটার জানালার সেই আলোটা কি নিভেছে এতক্ষণে ?

তারপরে, কেটে গেল প্রায় পনেরো দিন। সদাশিববাবু তুদিন থেকেই কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। এবার যাওয়ার পালা এলো অনুপমের। কিন্তু যাওয়ার আগে যে অভিনব ঘটনা ঘটে গেল ওর জীবনে, তার জন্য কি সে প্রস্তুত ছিল ?

প্রস্তুত ছিল কি অন্য কেউ ? প্রস্তুত ছিল কি শোভা ? প্রস্তুত ছিলেন কি স্নুলতা দেবী নিজেও ?

কিন্তু, সে কথা বলবার আগে কণিকার কথা একটু বলে নেওয়া দরকার।

সে যেন স্বেচ্ছাবন্দিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এসেছিল তার জ্যেঠামশায়ের সংসারে। প্রথম প্রথম সমাদর ছিল, তারপরে

কঠিন আর কঠোর শাসন! এমন কি, কণা অবাধ্য হলে তার গায়ে হাত তুলতেও বুঝি দ্বিধা করবেন না জ্যেঠামশাই! এ এক আশ্চর্য চরিত্র, আর আশ্চর্য পরিবেশও!

বাবার কাছে চিঠি লেখা চলে, কিন্তু সে লেখে না। নিজে যে এমন করে বন্দী হয়ে পড়েছে এখানে, এমন করে তার ওপর নিপীড়ন চলছে, একথা বাবাকে সে লেখে না কখনো, শুধু লেখে—'আমার জন্য ভেবো না, আমি ভালো আছি।'

বাবার চিঠি আসে কখনো হরিদ্বার থেকে, কখনো দ্বারকা থেকে, কখনো দাক্ষিণাত্য থেকে। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাবা। স্বপন-তপন আছে শান্তিনিকেতনে। সেখানেও ত যেতে পারত কণিকা! কিন্তু না, এখানে এই নিপীড়ন, এই যে বন্দীত্বের নিগড়ে তার পা দুখানি বাঁধা, এর মধ্য দিয়ে সে বুঝি কোনো ঋণ শোধ করছে! 'পংক্তির পর পংক্তি লিখছি, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছি!'—রবীন্দ্রনাথের 'ঋণশোধ'-এর উপানন্দের মতো সেও এক অব্যক্ত ছুটির আনন্দে বিভোর হয়ে আছে বুঝি!

যখন সে একা থাকে, তখন তার মন বুঝি আপনিই গুণগুণিয়ে উঠতে চায়,—'আরো—আরো প্রভু—আরো—আরো।
এমনি করে আমায় মারো!

সেদিন ঘনঘটায় আষাঢ় নামল সমস্ত আকাশটাকে কালো করে দিয়ে! আর, সেই খাঁচায় আবদ্ধ ময়ূরটা? সে উঠল নিদারুণ চঞ্চল হয়ে। যেন জোয়ার এলো ময়ূরটার দেহের শিরা-উপশিরায়। ওর রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে যেন নৃত্য করে উঠল উচ্ছৃঙ্খল এক উল্লাস! লোহার তার ঘেরা ক্ষুদ্র পরিসরটির মধ্যেই যেন বিশাল-ব্রহ্মাণ্ড এসে ধরা দিলো। ও তখন ভুলে গেল ওর সকরুণ বন্দীত্বের কথা, ভুলে গেলো সীমার ক্ষুদ্রতা, উন্মত্তস্বরে ডাকতে থাকল প্রাণপণে!

কণিকার বন্দী দশার নির্মম দুর্গে বুঝি একটি মাত্র জানালা ছিল দক্ষিণের বাতাস আসবার, সে হচ্ছে ওরই সমবয়সী একটি মেয়ে—ওর প্রবাস-বাসের একটিমাত্র বন্ধু—অপর্ণা। জ্যেঠামশায়ের এই সংকীর্ণ দুর্গে বাইরের কেউ আসে না। হয়ত ঘৃণা করেই আসে না। যদি বা দরকারে কোনো পুরুষমানুষ আসে, ত নীচেকার বসবার ঘরে এসে বসে, জেঠামশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, আবার চলে যায়। জ্যেঠামশাই তাদের কাউকে খাতির করে এক কাপ চা-ও খাওয়ান না।

ওপরে বাইরের পুরুষদের মধ্যে একটি মাত্র লোকেরই আসবার অধিকার ছিল, তিনি হচ্ছেন স্থানীয় ডাক্তারবাবু। জ্যেঠাইমাকে দেখতে প্রায়ই আসতেন তিনি। ওকেও এক কাপ চা খাওয়াবার প্রয়োজন বোধ করেন না বাড়ির কেউ। অথচ, সদানন্দময় ভারী সরল প্রকৃতির মানুষ উনি! কণিকাকে প্রথম দিন দেখেই কাছে ডেকে নিয়ে আলাপ করেছিলেন। বলেছিলেন—কী নাম মা তোমার?

—কণিকা মুখোপাধ্যায়।

—বেশ মা, বেশ। পড়ো?

উত্তর দিয়েছিলেন জ্যেঠামশাই—চেঞ্জে এসেছে। আমার কাছে দিনকতক থাকবে। ওর মা মারা গেছে সম্প্রতি।

—আহা মা!—ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ততক্ষণে, বলেছিলেন,—খুব একা একা লাগে ত? দাঁড়াও, আমি বাড়ি গিয়েই আমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমারই বয়সী। দুজনে খুব বন্ধুত্ব হয়ে যাবে।

সত্যিই। অচিরেই ডাক্তারবাবুর মেয়ে অপর্ণার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল কণিকার। যখন তখন অপর্ণা আসত, সময় পেলেই আসত। জ্যেঠাইমা ত বিছানায় শোয়া, টের পেতেন না সব সময়। টের পেতেন জ্যেঠামশাই, চারিদিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

কিন্তু, অপর্ণার আসা-যাওয়া নিয়ে, কী ভাগ্য, এখনো পর্যন্ত কিছু বলেন নি তিনি।

—থাকিস কী করে?—অপর্ণা একদিন বললে—একদিকে পাগল বুড়ী, অন্যদিকে ঐ হাড়কেপ্পন বুড়ো, আমি হলে ত পালিয়ে বাঁচতুম!

অপর্ণা ওর সব কথাই ততদিনে শুনে নিয়েছে, একদিন বললে—শান্তিনিকেতনে চলে যা না, ভাইদের কাছে?

—না।—কণিকা ওকে অবাক করে দিয়ে বলেছিল—সেখানে গেলে ত পড়াশুনা করতে হবে! সত্যি বলছি ভাই, বই নিয়ে বসতেও ইচ্ছা করে না। পড়ায় মন লাগে না একটুকুও! না ভাই, বেশ আছি।

তারপরেই একটু হেসে বলেছিল—আমার কথা থাক, তোর কথা বল দেখি?

অর্পণা হেসে ফেলত। বলত—হয়েছে, আমার কথা আর শুনতে হবে না।

অপর্ণাদের বাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে একটি ছেলে নতুন এসেছে তার বিধবা মাকে নিয়ে। ছেলেটিকে খুবই বুঝি ভালো লেগে গেছে অপর্ণার। সেই কথাই দেখা হলে বারবার জানতে চায় কণিকা। কিন্তু অর্পণা বলতে চায় না কিছুতেই।

অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন শুধু বললে—খুব ভালো লোক। ছবি আঁকে।

—সত্যি?

—সত্যি।

অষ্টাদশী দুটি তরুণী। সংসারের কতটুকু জটিলতাই বা ওরা বোঝে? শুধু সময়ে অসময়ে স্বপ্নিল হয়ে ওঠে মন, পাখীর মতো কল্পনার আকাশে ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়!

—আলাপ হয়েছে?—কণিকা জিজ্ঞাসা করেছিল—কীরে, উত্তর দে?

—হয়েছে।

—কী করে হলো ?

—যাঃ! বলব না!—লজ্জা পেয়ে মেয়েটা ছুটে পালায়। দরজার কাছ থেকে অপসৃত হবার পূর্ব মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে বলে যায়—চললাম। আরেকদিন এসে বলব। আকাশ জুড়ে বৃষ্টি আসছে! তোদের ময়ূরটা কী ভীষণ ডাকছে! বাব্বাঃ!

বৃষ্টি! ময়ূর!

তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় কণিকা। শিকগুলি জড়িয়ে ধরে দূরের ঐ বাংলো বাড়িটার দিকে সন্তর্পণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কী করছে ? কী করছে এখন সে ?

দিগন্তের রেখা ঘন বর্ষণ ধারায় মুছে গেছে ততক্ষণে! বৃষ্টি এসে পড়ছে তার মুখে, মাথায়, বুকে, বাহুতে। আর, নীচে থেকে শোনা যাচ্ছে বন্দী ময়ূরের ডাক! অস্থির হয়ে ঝটপট করছে। উড়তে চাইছে, কিন্তু পারছে না। তাই করুণ কণ্ঠে ডাকছে মুহুর্মুহু।

দোতলার অন্য প্রান্তের ঘরখানায় খাটের ওপরে একভাবে শুয়ে আছেন মৃদুলা দেবী। কতদিন ধরে যে শুয়ে আছেন, কত মাস, কত বছর, সে যেন হিসাবেরও অতীত।

কণিকা যখনই যায় ওঁর ঘরে ওষুধ খাওয়াতে, তখনই উনি কর গণনা শুরু করেন, বলেন— বলিস কী! এতগুলো বছর আমি বিছানায় পড়ে আছি! হায় ভগবান!

নিঃসন্তান প্রৌঢ়া মহিলাটি ছোট মেয়ের মতো কেঁদে উঠেন তারপরে।

—জ্যেঠাই মা!—কণিকা বলে—ফের কাঁদছেন ? এখ্খুনি গিয়ে জ্যেঠামশাইকে বলে দিয়ে আসব।

—যা না, এখ্খুনি যা, আমায় এসে মেরে ফেলতে বল! আমি মরলে তোর জ্যেঠা ত বাঁচে, সাত তাড়াতাড়ি আর একটি বিয়ে করে আনবে'খন।

বলতে বলতে কালিমায় ভরা রোগজীর্ণ শীর্ণ মুখখানা অতর্কিত উত্তেজনায় ভরে ওঠে জ্যেঠাইমার। কণিকা তাড়াতাড়ি পাখা নিয়ে এসে শিয়রে দাঁড়ায়, কিন্তু সব সময় ফল হয় না, কোন কোন দিন হাত পা ছুঁড়ে প্রায় চীৎকার করে ওঠেন মৃদুলাদেবী। অসংলগ্ন প্রলাপের মতো বলতে থাকেন,—আমার কাছে কেন, যাও না জ্যেঠার কাছে! মুখপুড়ী, এরই মধ্যে ত মাকে পেটে পুরে বসে আছ! বাপটাকে বাউণ্ডুলে করে ছেড়েছ! এখন, আমার সংসারেও এসে আগুন জ্বালাতে চাও!

কণিকা নিশ্চুপে হাতের পাখাটা নাড়ে, কিছু বলে না। এসব তার গা সওয়া!

মেঝেয় বসে থাকা ঝি-টি কিন্তু আপন মনে অস্ফুট ঝংকার দিয়ে ওঠে, বলে—যথেষ্ট ভোগান্তি আছে দিদিমণি, ও বুড়ী কি আর সহজে মরবে?

সেদিন ডাক্তারবাবুও বলে গেছেন এই কথা। বেশীদিন আর নয়, মস্তিষ্ক বিকৃতি ত আছেই, তার ওপরে বিকার দেখা দিচ্ছে তীব্রভাবে!

একদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অন্যদিকে মাথারও এই অবস্থা! দেখে দেখে জ্যেঠাইমার ওপরে রাগ-অভিমান হয় না। বরং মায়া আসে, করুণা আসে।

—ও পাগলী বুড়ীর কথায় তুই কিন্তু রাগিস না মা!—মাঝে মাঝে জ্যেঠামশায়ের কণ্ঠে অভাবিত অদ্ভুত স্নেহের সুর ফুটে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য, কণিকা তাঁকে আজও পর্যন্ত চিনে উঠতে পারল না। নীচের ঘরে থাকেন। ঘর ভর্তি আলমারী-ঠাসা যত রাজ্যের পুরাণো বই। সেইগুলিই উল্টেপাল্টে পড়েন তিনি।

আরও একটি জিনিষ আছে জ্যেঠামশাইয়ের ঘরে, সেটি একটি লোহার সিন্দুক। পাড়ায় রটনা, সকালবেলা জ্যেঠামশায়ের মুখ দেখে উঠলে নাকি হাঁড়ি ফাটে। সিন্দুকে কী আছে, কণিকা তা

অবশ্য জানে না। লোকে বলে, তার জ্যেঠামশায় নাকি মস্ত বড়-লোক। হবেও বা। তবে একমাত্র এই বাড়িটা ছাড়া আর তার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না, কী বাসনে কী ভূষণে! আর আছে বলবার মধ্যে ঐ বদ্ধ খাঁচার-জীবটা।

একদা যৌবনে ওটা নাকি সখ করে পুষেছিলেন তার জ্যেঠাই মা, জ্যেঠামশায়ের আপত্তি সত্ত্বেও। এককালে জীবটির যত্ন ছিল, আজ আর নেই। ঝি-টি দয়া করে কোনোদিন খাবার দেয় কোনোদিন দেয় না। দুর্বিষহ বন্দীত্বে জরা-দুর্বল দিনগুলি ওর কোন রকমে গড়িয়ে চলেছে।

এক একদিন, অবাক হয়ে যায় কণিকা, জ্যেঠাইমা মাঝে মাঝে কিন্তু ভারী স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেন। সেদিন রাত্রে জ্যেঠামশায় একবার এসেছিলেন জ্যেঠাইমার ঘরে। কপাটের আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল কণিকা, জ্যেঠাইমা বলছে,—হ্যাগা, তুমি করছ কী, ওর বাপকে চিঠি লেখো, বাপে জ্যেঠায় মিলে ওর একটা বিয়ে দাও, মেয়ে যে এদিকে বুড়ী হয়ে গেল!

গম্ভীর কণ্ঠে জ্যেঠামশায় বললেন,—আঠারোতেই মেয়েরা আজকাল বুড়ী হয়ে যাচ্ছে নাকি? বিয়েটা একটা খেলার ব্যাপার নয়। আর তাছাড়া, জানোনা ওর কথা? পুরানো সম্বন্ধ ও মেয়ে ভেঙে দিয়ে এসেছে! বিয়ে ও এখন করতে চায় না।

—বুঝেছি, বুঝেছি!—আবার সেই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠেন জ্যেঠাইমা, আবার সেই অসংলগ্ন উক্তি বেরিয়ে আসে ওঁর মুখ থেকে,—ওর বিয়ে দিলে তোমারই বা চলবে কেন?

—মৃদুলা!—যেন বজ্র গর্জে ওঠে জ্যেঠামশায়ের কণ্ঠে।

—জানি, জানি, সংসারে আমার আগুন লেগেছে!—কী-আশ্চর্য, হঠাৎ-ই আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন জ্যেঠাইমা।

ঘরে ফিরে এসে, শূন্য শয্যায়, কণিকাও উচ্ছসিত কান্নায় ভেঙে

পড়ে। ঘন আর নিবিড় অলকগুচ্ছ এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, বেশবাস বিস্রস্ত, উচ্ছলিত, নিটোল তনুদেহে কান্নার তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

পর মুহূর্তেই শোনা যায়, দরজার কাছে পায়ের শব্দ। ধড়মড় করে উঠে বসে কণিকা, দরজার কাছ থেকে ভেসে আসে জেঠা-মশায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বর,—কণিকা, একবার এসো আমার ঘরে।

মাঝে মাঝে কণিকার ভারী ভয় হয় জ্যেঠামশায়কে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বাড়ির হাওয়া ভয়ানক বিষাক্ত হয়ে উঠছে! এখানে স্বচ্ছন্দে শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হয়। তখন মনে হয়, বাবাকে সব কথা খুলে লেখে কণিকা। লিখে, এখান থেকে চলে যায়।

—দেখ মা—জ্যেঠামশায় তাঁর ঘরে পায়চারী করতে করতে বলেন,—লোকে তোর বিয়ের কথা বলছে। কিন্তু আমি তোর মতে মত দিচ্ছি। তুই বিয়ে করিস না! তরুণ বয়সে বিয়ের স্বপ্ন সবাই দেখে, কিন্তু মা, ওটা মরীচিকা। শুধু পথই ভোলায় পথের সন্ধান দেয় না!

স্বল্পালোকিত ঘরখানায় বড়ো অদ্ভূত দেখায় জ্যেঠামশায়কে, বড়ো ভীষণ, বড়ো ভয়ঙ্কর!

—কণিকা!—জ্যেঠামশায় কাছে এলেন, তারপরে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন,—আচ্ছা যা, রাত হলো, শুয়ে পড় গিয়ে।

কণিকার ঘর। দরজায় খিল দিয়ে আবার বিছানায় এলিয়ে পড়ে কণিকা। বহুদূর দৃষ্টি যায় জানালা দিয়ে। ওদের বাগান যেখানে শেষ হয়েছে, তার পাশেই তো সেই পুরানো বাংলো প্যাটার্ণের একতলা বাড়িটা! সে এখন কী করছে, কে জানে? হয় তো তারও চোখে আজ ঘুম নেই, উদাস দৃষ্টি মেলে বৃষ্টি দেখছে!

তাকে কি চিনতে ভুল হয়েছে কণিকার? কখনই না।

একবার দেখেই চিনতে পেরেছে এবং চিনতে পেরে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেছে মুহূর্তে!

প্রথম দিকে সে নিজে চেনা দেয়নি, শুধু শোভা মেয়েটিকে বেড়ার কাছে একা পেয়ে ডেকে আনিয়েছে অপর্ণাকে দিয়ে।

তারপর ওর সঙ্গে ভাব করে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একে একে জেনে নিয়েছে সব কথা, আশ্চর্য হয়ে ভেবেছে, মা একে না দেখেই এর সম্বন্ধে বলেছিল,—ফরসা টুকটুকে রঙ! মানুষ দূর থেকে কতো কী-ই না কল্পনা করে নেয়!

শোভা চলে গেছে, অপর্ণাকেও কিছু জানতে দেয়নি কণিকা। সে শুধু আড়াল থেকে শোভা আর অনুপমকে লক্ষ্য করে গেছে। শোভা ওর ওপর কর্তৃত্ব করে, কিন্তু ও এত মনমরা কেন সর্বক্ষণ? তবে কী, তবে কী ও সুখী নয়?

একদিন রাস্তার ধার দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অনুপম। সে বাইরে, আর কণিকা বাগানের মধ্যে।

ওকে দেখে সে যেন সাপ দেখার মতো চমকে উঠেছিল। কিন্তু কী আছে এমন করে চমকে ওঠবার? ওকে এখানে বুঝি আশাই করতে পারেনি অনুপম? কেন পারেনি? ওদের কোন খবরই কী সে রাখেনি?

মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করে সে বলেছিল,—আপনাদের ময়ূরটা ভারী সুন্দর তো! দেবেন আমাকে? ওদের বলে কয়ে আমি নিশ্চয়ই পুষব।

কী উত্তর দেবে কণিকা? অদ্ভুত লজ্জায় আর সংকোচে সে পালিয়ে এসেছিল। তার পরে আরও কয়েকবার ওদের দেখা হয়েছে, কণিকা জানালায় আর অনুপম রাস্তায়।

কিন্তু সেদিন দুপুরে? আজও তার কথাগুলি যেন মধুর হয়ে কানে এসে বাজছে।

একেবারে সোজা বাগানের মধ্যে বাড়ির কাছে চলে এসেছিল

অনুপম, বলেছিল,—এই দেখুন, মানুষের হৃদয়ের কথা এক মানুষ ছাড়া, আর সবাই বোঝে খুব সহজে। সেদিন ময়ূরটা চেয়েছিলাম, আপনি দেন নি, যাকে চেয়েছিলাম আজ সে নিজেই উড়ে গিয়ে হাজির!

—ওমা সেকি!—সব ভুলে অবাক হয়ে যায় কণিকা, ময়ূরের ব্যাপার নিয়েই বলে,—গেল কী করে?

—নিশ্চয়ই খাঁচা ভাঙা ছিল।

তু'জনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

খাঁচাটা দেখেই অনুপম বলে,—ঐ দেখুন, যা বলেছি ঠিক তাই। খাঁচার ঐ কোণটা ভাঙা।

ময়ূরটাকে সযত্নে খাঁচার ভিতর গলিয়ে দিয়ে ভাঙা কোণটাতে কয়েকটা কঞ্চি পুঁতে দেয় অনুপম। তারপর কণিকার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে,—খাঁচার জিনিষ খাঁচাতেই রেখে দিলাম। আমি কী আর সত্যিই চেয়েছিলাম? রাখব কোথায়? আপনি দেবার মতো উদার কিনা সেইটাই পরখ করছিলাম।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল কণিকা। বলতে চেয়েছিল—আমাকে চেনা দিতে চাও না—না-কী? এ আবার কি অভিনয়?

আপন মনেই হাসতে থাকে অনুপম, বলে,—যেখানে আছি, ওরা আমার কেউ না। ওঁরা কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন টেনে, কী আর করি, চলে এলুম, দেশটাও তো দেখা হলো।

তুটি চোখ ছলছল করে ওঠে কণিকার, কোনক্রমে সে বলে ওঠে,—কেন, বিয়েটা হবে না?

তেমনি সহজভাবেই হাসতে হাসতে বলে অনুপম—হ্যাঁ, হবে। আপনার হবে না?

কীসের একটা আবেগ এসে কণ্ঠরোধ করে ধরে মুহূর্তে। কথা বলা হয় না। অনুপম কিন্তু নিজের আবেগে নিজেই বলতে থাকে,

—আচ্ছা, আপনার এমন চমৎকার চুল। আপনি খোঁপা বাঁধেন কেন? এলো করে রাখবেন, ভারী সুন্দর দেখাবে। আর চোখে দেবেন কাজল, অতি চমৎকার মানাবে আপনার চোখে!

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না কণিকা, চোখে আচল দিয়ে ক্রন্দন বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠে—কী তুমি! তুমি কী!

—আমার নাম অনুপম। সর্বনাশ, সেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়! ঐ দেখুন হন্‌হন্‌ করে শোভা আসছে এদিকে!

সেই ফর্সা রঙ দাম্ভিকা মেয়ে শোভা কঠোর ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো,—ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—দুপুর বেলা বাড়ির সব ঘুমুচ্ছে, এই সুযোগে দিব্যি পালিয়ে আসা হয়েছে দেখছি! লজ্জাও করে না! বলে হন্‌হন্‌ করে পা ফেলে চলে যায় শোভা। আর, সে দু'পা তার পিছনে পিছনে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। কী করুণ—কী অসহায় ওর মুখের ভাব! এবার আর অভিনয় নয় গাঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে সে—চললাম। তুমি ভালো আছো ত, কণা?

কিন্তু, উত্তরটা শুনে যাবার জন্য সে আর দাঁড়ালো কই? না শুনেই চলে গেল।

তা যাক, কিন্তু, ওতো সুখে নেই! যা করছে, যা করতে যাচ্ছে, সবই বুঝি ওর স্বেচ্ছাবন্দীত্ব ঠিক কণিকার মতো!

তাই কিছুক্ষণ স্তম্ভিত একখণ্ড নিশ্চল পাযাণের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কণিকা।

পিছন থেকে গম্ভীর কঠোর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো জ্যেঠামশায়ের—কণিকা!

আর সেই কণ্ঠস্বরে প্রবল চমকে থরথর করে কেঁপে উঠল কণিকা।

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে কাছে চলে এলেন জ্যেঠামশায়। সরে এলেন খুব কাছে, তারপর সে যেমন বলেছিল চুল এলো

করলে ভালো দেখায়, তেমনি এলো হয়ে গেল কণিকার চুল জ্যেঠামশায়ের শক্ত হাড়ের মতো শীর্ণ হাত দৃঢ় কঠোর মুঠিতে চুল সজোরে আকর্ষণ করল।

—আমার এই তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ফাঁকি দেওয়া অতো সহজ নয়, একরকম অসম্ভবই মনে করতে পারো!

তারপর নীচের একটা পরিত্যক্ত ঘরের কোণে কণিকা আবদ্ধ হলো। ঘরের মধ্যে সজোরে ঠেলে দিয়ে জ্যেঠামশাই দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলেন।

—ছেলেটাকেও শাস্তি দিতাম, শুধু দিলাম না লোক জানাজানির ভয়ে—কলঙ্কের ভয়ে!

কণিকা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠল।

—কাঁদো, কিন্তু আস্তে। তোমার জ্যেঠাইমার কানে যদি যায়, ত আস্ত রাখব না!

অবশ্য, সন্ধ্যার কিছু আগেই দরজাটা খুলে যায়। আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে কণিকা। অঙ্গের বসন সম্পূর্ণ এলোমেলো।

জ্যেঠামশায় কাছে এসে ডাকলেন,—কণিকা?

তাড়াতাড়ি উঠে বসে কণিকা, আচলটা সামলে নেয়।

—এসো, কথা আছে।

মাথাটা তখনও ঝিম্ ঝিম্ করছে। সেই অবস্থায়ও ধীর পায়ে জ্যেঠামশায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হয়।

—বোসো, ঐ চেয়ারটায়।

বসে কণিকা।

—দেখ, তোমাকে ঘরে বন্ধ রেখেছিলাম বলে নিশ্চয়ই রাগ করেছ। ভেবেছ, ভয়ানক নিষ্ঠুর আমি। ভাবো, ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি জানি কঠিন কর্তব্যবোধই আমাকে এতটা কঠোর হতে হয়েছে।

পায়চারী করতে লাগলেন জ্যেঠামশায়, বলতে লাগলেন—আমার কর্তব্য আমার অভিজ্ঞতা, আমার শিক্ষা পরবর্তী কালকে দিয়ে যাওয়া! সেই শিক্ষাই তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। তোমার মতো তরুণ বয়সে আমিও স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু স্বপ্ন আর জীবন এক নয়।

জ্যেঠামশায় আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ওপর থেকে দুড় দাড় করে ঝিটা নেমে এলো।

—বাবু,—দিদিমণি—শীগগীর আসুন মা কেমন করছে!

কণিকা উঠে দাঁড়াল। জ্যেঠামশায় ধীর গভীর কণ্ঠে ডাকলেন,—এই ঝি, শোন?

ঝি সরে এলো।

—আমরা দুজনে যে এ ঘরে রয়েছি, তোর মা জানে?

—হ্যাঁ।

—হুঁ, বুঝেছি। আচ্ছা যা। আমরা যাচ্ছি।

ওপরে গিয়ে দেখে ওরা, জ্যেঠাইমার দেহটা শক্ত ধনুকের মত বেঁকে গেছে, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ঠোঁটে অল্প অল্প ফেনা, ফিট্ হয়েছে জ্যেঠাইমার।

কণিকা তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে চোখ মুখে মাথায় জল দিতে লাগল। করতে লাগল পাখার বাতাস,—জ্যেঠামশায় স্থির দৃষ্টি মেলে সবই দেখছিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্যেঠাইমার জ্ঞান ফিরে এলো, কিন্তু দুর্বলতা অত সহজে গেল না।

পরের দিনের কথা। সমস্ত মধ্যাহ্ন জুড়ে আকাশ নীল ছিল। অপরাহ্নে দিগন্তরেখায় দেখা গেল মেঘ। সন্ধ্যার আগেই আকাশ ভরে গেল মেঘে।

কণিকা আজ সারাটা দিন কী করেছে কে জানে ?

আকাশ পাতাল তার নিজের কথাই হয়ত ভেবেছে। ভেবেছে জ্যেঠামশায়—জ্যেঠাইমার কথা। হয়ত ভেবেছে আরও একজনের কথা।

সন্ধ্যায় জ্যেঠামশায়ের ঘরে তাঁর সামনে আবার দাঁড়াতে হলো কণিকাকে। নিস্তেজ সাপুড়ের সাপকে বারবার শুনতে হয় সাপুড়ের সেই একঘেয়ে একটানা বংশীধ্বনি !

কিন্তু হঠাৎ সে সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে এলো। জ্যেঠা-মশায় থেমে গেলেন, বললেন,—জল এলো। জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে যা ত কণিকা।

বন্ধ হলো জানালা।

—আচ্ছা, এবার যেতে পারিস।

আশ্চর্য, ইজিচেয়ারের মধ্যে এলিয়ে পড়ে জ্যেঠামশায় তুই হাতে মুখ ঢাকলেন।

বাইরে অবিরল বৃষ্টি। কণিকা ধীর পায়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু, এ-কী! তু'চোখ ভরে এখনো স্বপ্ন দেখছে না ত কণিকা ?

টেবিলের ওপর আলো। একটি বই খুলে নিয়ে সামনে বসে আছে স্বয়ং অনুপম !

—এ-কী !

মুখ তুললো সে, বলল,—হ্যাঁ, আমি। অবাক হয়েছ ত ?

রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল কণিকা—কী করে এলে ?

—এলাম। ওদের সঙ্গে তোমাকে কেন্দ্র করেই প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেছে। এই রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে শোভা বলল, বেরিয়ে যান। এমন কি ওর মা-ও মেয়েকে শান্ত করতে পারলেন না। তাই বেরিয়ে এলাম, এবং চিরতরেই।

কণিকা দাঁড়িয়ে রইল। সব মিলিয়ে কিছুই যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। স্বপ্ন নয় ত ?

—সোজা গেট খুলে চলে এলাম,—অনুপম বলতে লাগল,—নীচের ঘরে তোমাকে দেখলাম,—তোমার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে কথা কইছ। ভিজে পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে ওপরে চলে এলাম, আন্দাজে বুঝলাম এই-ই তোমার ঘর।

চুপ করে আছে কণিকা। সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। অনুপম ধীরে ধীরে ওর কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে—মনে আছে সেই কথাটা? তোমাকে লিখেছিলাম—'তুমি আমার প্রেরণা!' মনে আছে? বিশ্বাস করো, সে কথা মিথ্যে নয়। আমার জীবনে সে হচ্ছে চিরদিনের সত্যি। বাপ-মায়ের অবাধ্য হইনি, যা বলেছিলেন মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু, বিধাতার অভিলাষ বোধহয় অন্য। নইলে, তুমিই বা শান্তিনিকেতন না গিয়ে, বাবার সঙ্গে না বেরিয়ে পড়ে, বেছে বেছে তোমার জ্যেঠামশায়ের কাছে, এই কার্মাটাড়ে আসবে কেন? কী গো, আজ ত সব ঠেলে ফেলে কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, আমাকে কি তাড়িয়ে দেবে?

কী হলো কে জানে, হঠাৎ কণিকা অনুপমের বুকের ওপর মুখ রেখে ভেঙে পড়ল কান্নায়—বাঁচাও আমাকে, নিয়ে চলো এখান থেকে, এখানে থাকলে মরে যাবো আমি।

সস্নেহ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল অনুপম।

বুঝি এমনিই হয়। দুঃসহ বেদনার স্পর্শে অকারণ গোপনীয়তা, দুরন্ত লজ্জা—সমস্ত ভেঙে যায়। বেরিয়ে আসে আলো ঝলমল মুক্ত প্রেম, তার প্রোজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত অন্ধকার মুহূর্তে মুছে যায়।

অনুপম ডাকল,—কণিকা? কণা?

—উঁ?

—কেউ যদি এখন আসে?

—আসুক।

—ধরো যদি জ্যেঠামশায় নিজে আসেন।

—অসুন, মেরে ফেলুন আমাকে।

অনুপম ওর মুখখানা দু'হাতে তুলে ধরল।

বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ। লৌহপিঞ্জরের মধ্যে ময়ূরটা তখন একবার থমকে দাঁড়িয়েছে। যেন জোয়ার এসেছে ওর বন্দী-দেহের শিরায়-উপশিরায়, ক্ষুদ্র পরিসরটির মধ্যেই যেন ধরা দিয়েছে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, ও ভুলে গেলো বন্ধন, সীমার ক্ষুদ্রতা—উন্মত্ত স্বরে হঠাৎ ডেকে উঠল। আকাশ থেকে সাড়া এলো ঘন গভীর মেঘ-ডম্বরুর।

দরজায় কার যেন ছায়া পড়ল এই সময়।

অনুপম চমকে বলল,—কে?

কোথা থেকে দুঃসাহস এলো কণিকার কণ্ঠে, বলল,—কেউ নয়, তুমি চুপ করো লক্ষ্মীটি!

অথচ, আমরা জানি, সে ছায়া জ্যেঠামশায়ের। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ওরা এড়াতে পারে নি। কিন্তু, তিনি আজ চুপি চুপি পালাতে লাগলেন তাঁর নিজের ঘরে—যুদ্ধক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত, পরাজিত সৈনিকের মতো!

সেই রাত্রে যা প্রচণ্ড বিস্ময় হয়ে অপর্ণাদের বন্ধ দরজায় এসে ঘা দিলো, তা হচ্ছে কণা আর অনুপমের যুগ্ম আবির্ভাব!

বজ্র বিদ্যুৎ আর বৃষ্টি! এ সব মাথায় করে কেউ যে সত্যিই পথে নেমে পড়তে পারে, এ বুঝি অপর্ণাদের কাছে ধারণাও অতীত। তাই অপর্ণার দাদা অনিমেষ যখন এসে দরজা খুলে সর্বাঙ্গ সিক্ত একটি অচেনা তরুণী মেয়ে আর অপরিচিত তরুণ পুরুষকে দেখতে পেলো, তখন সে রীতিমত চমকে দুপা পিছিয়ে এসছিল বই কী!

দরজা খুলতেই দৌড়ে ভিতরে ঢুকে পড়লে কণা, কিন্তু অনুপম বাইরে দাড়িয়ে যেমন ভিজছিল তেমনি ভিজতেই লাগল।

—কে!—একথা মুখ ফুটে বলতে পেরেছিলেন কি অনিমেষ?

মেয়েটি ভিতরে এসেই বললে—অপর্ণা কোথায়? আমি অপর্ণার বন্ধু।

—ডেকে দিচ্ছি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অনিমেষ।

ঘরখানা, যাকে বলে বৈঠকখানা বা বসবার ঘর, তাই। কয়েকটা চেয়ার, বেঞ্চি আর একটা টেবিল আর চাদর বিছানো একখানা তক্তপোষ।

—এই, ভিতরে এসো, ভিজছ যে!

নিম্নকণ্ঠে একথা বললেও অনুপম ভিতরে এলো না, বাইরে দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজতে লাগল।

অপর্ণা আর তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলেন অপর্ণার বৌদি, মায়া। অপর্ণার থেকে বছর দুয়েকের বড়ো হবে, বছর-খানেক হলো মাত্র বিয়ে হয়েছে।

অপর্ণা কল্পনাও করতে পারে নি যে, ঘরে ঢুকে সে দেখতে পাবে কণিকাকে, এই ভাবে!

—তুই!

—হ্যাঁ, ভাই।

অপর্ণার চোখ পড়ল বাইরে। চমকে বলে উঠল—উনি কে?

—ওঁকে তুই দেখেছিস। সব বলছি, আগে ওঁকে ভিতরে আসতে বলনা ভাই!

এগিয়ে গেল অপর্ণা। অনুপমকে ভিতরে ডাকল।

গায়ের জামা আর ধুতি ভিজে গেছে, মাথা মুখ জলে ভর্তি। অপর্ণা আর মায়া একবার ওর দিকে আরেকবার কণার দিকে সবিস্ময় তাকাতে লাগল।

মায়াই কথা বলল প্রথমে। অপর্ণাকেই সে বললে—সব কথা পরে হবে, আগে আয় আমার সঙ্গে।

ভিতরে চলে গেল ওরা দুজনে।

কণা অনুপমের দিকে তাকিয়ে বললে—দরজাটা বন্ধ করে দাও, বৃষ্টির ছাঁট এসে ঘর ভাসিয়ে দিলো যে।

দরজায় খিল তুলে দিলো অনুপম, তারপরে বললে—জলে-জলে আমরাই ঘর ভিজিয়ে দিয়েছি, বৃষ্টি এসে আর নতুন করে কী করবে? সত্যি, এখানে এসে এদের বড়ো অসুবিধায় ফেললাম, তাই না?

কণা বললে—এ ছাড়া উপায় ছিল না।

তারপরেই একটু হাসল সে অনুপমের দিকে তাকিয়ে, বললে—ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরক্ষণেই ঘরে এলো অপর্ণা। হাতে তার শুকনো ধুতি, সার্ট আর তোয়ালে। ওগুলি তক্তপোষের ওপর রেখে সে কণিকাকে বলল—ওকে ভিজে কাপড় ছাড়তে বল না ভাই। আর তুই আমার সঙ্গে ভিতরে আয়।

ত্বরিত পায়ে ওরা চলে গেল ভিতরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকনো শাড়ী আর ব্লাউজ পরে, পিঠের ওপরে ভিজে চুলের রাশি এলিয়ে দিয়ে কণিকা ফিরে এলো। ততক্ষণে অনুপমও বেশ পরিবর্তন করে নিয়েছে। ওর ভিজে কাপড়গুলি তুলে নিতে নিতে কণা বললে—বসে থাকো একটু একা একা, কেমন? আমি একটু পরেই আসছি।

একটু পরের অর্থ হয়ে দাঁড়ালো প্রায় একঘণ্টা। বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষণের তখনো বিরাম নেই! ইতিমধ্যে অবশ্য, বাড়ির ভৃত্য-স্থানীয় একটা লোক এসে ওকে চা দিয়ে গিয়েছিল, ঘরের মেঝেটাও মুঝে টুছে ঠিক করে দিয়েছিল।

ভিতরে বসে ওরা দুই বন্ধুতে গল্প করছে। মায়া এসে বসছে মাঝে মাঝে, আবার মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে।

অপর্ণার মা বেঁচে নেই, সংসারে ঐ দাদা-বৌদি, আর বাবা। অপর্ণা বললে—তোরা দরজার কড়া নাড়ছিস, আমরা ভাবলুম—বাবা। বাবা একটা কল্ পেয়ে সেই যে বেরিয়ে গেছেন এখনো ফেরেন নি। বৃষ্টির জন্য কোথাও আটকা পড়েছেন হয়তো!

কণিকার সব কথা শুনে অপর্ণা বললে—স্বয়ম্বরা হলি শেষ পর্যন্ত?

কণিকা বললে—কেন হবো না? আঠারো পেরিয়ে গেছি অনেকদিন, এখন আমি সাবালিকা। কার সাধ্য আটকাবে?

—ওমা! সেও জানিস!

এ যেন অন্য এক কণিকা কথা বলছে। বললে—কেন জানব না? কাগজে 'আইন-আদালত' এর পাতা থাকে কী করতে?

দুই বন্ধুতে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল একযোগে।

রান্নাঘরটা পাশেই। সেখান থেকে মায়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,—কী অতো হাসাহাসি করছিস দুটিতে মিলে?

বলতে বলতেই ভিতরে এলো মায়া, বললে—তার থেকে ওঘরে যা। ভদ্রলোক একা রয়েছে না?

অপর্ণা ঝংকার দিয়ে বলে উঠল—থাকুক না একটু একলা! একটু আকাশ-পাতাল ভাবুক!

মায়া বললে—তোর দাদা গিয়ে ত একটু বসলে পারে! তা যাবে না, ক্যালকুলাসের অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে!

বলেই, হেসে ফেলল মায়া, কণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—সত্যি ভাই, এমন বাদ্‌লার দিন লোকে ত কাব্য পড়ে? তা নয় উনি সেই সন্ধ্যে থেকে ঠায় অঙ্ক কষে চলেছেন। অধ্যাপককে বিয়ে করলুম, ভাবলুম, কতো কবিত্বই না করবে। ওমা, এসে দেখি, অঙ্কের অধ্যাপক।

ওর বলার ঢংয়ে আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল।

অপর্ণা বললে—ঈস্, বৌদির যেন কতো বিরাগ! কণাকে বলে দেবো সব কথা?

—হয়েছে, আর অতো সর্দারী করতে হবে না।—বলে, মুখ লাল করে মায়া চলেই যাচ্ছিল রান্নাঘরে, দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে একবার ফিরে দাঁড়ালো, বললে—তার চেয়ে নিজের গল্পটা বল না? সে-ও কি কম নাটক করে ফেলেছিস নাকি!

—যাও!—বলে, ঝংকার দিয়ে উঠল অপর্ণা মিটিমিটি হাসতে হাসতে মায়া চলে গেল রান্নাঘরে। অতিথি-সৎকারের আয়োজনে সে ব্যস্ত।

বৃষ্টি ধরে আসতে লাগল আরও ঘণ্টাখানেক। দরজার ঘা পড়ল। এবারে এসে দরজা খুলে দিলো অপর্ণা।

ডাক্তারবাবু অর্থাৎ অপর্ণার বাবা ঘরে ঢুকে অনুপমকে দেখেই চমকে উঠলেন, বললেন—কে?

অপর্ণা বললে—আপনি চিনবেন না বাবা, ভিতরে চলুন, সব বলছি। কণিকা বসে রয়েছে আপনার জন্য।

—কে! কণিকা?—আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

মেয়ে বললে—চিনতে পারছ না? বিজনবাবুর ভাইঝি—কণা।

—বিজনবাবুর ভাইঝি!

বিজনবাবু কণিকার জ্যেঠামশাইয়ের নাম।

ডাক্তারবাবুর যেন চমক ভাঙল কথাটায়। বলে উঠলেন—কেন? ওর জ্যেঠাইমার অসুখটা আবার বেড়ে গেল নাকি?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অপর্ণা বললে—না না, সে সব কিছু নয়, ভিতরে এসো, এসেই সব শুনো'খন।

কেটে গেলে আরও কিছুক্ষণ। খেতে খেতেই সব শুনতে

লাগলেন ডাক্তারবাবু মেয়ের কাছ থেকে। শুনে, একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

কণা যখন ওঁর ঘরে এসে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, তখন সস্নেহ কণ্ঠেই তাকে বললেন ডাক্তারবাবু,—কাজটা খুব ভালো করলে না মা, জানো ত তোমার জ্যেঠামশাইকে ?

কণা বললে—এই রাতটা আমাদের একটু ঠাঁই দিন ডাক্তারবাবু কাল সকালেই আমরা কলকাতা চলে যাবো।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেটা কে ?

কণা বললে—আমাদের বাড়ির পাশে যে পড়ো বাংলোটা ছিল, সেইখানে ওরা এসেছে আজ দিন পনেরো হলো।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখেছি বটে, চেঞ্জার এসেছে ও বাড়িতে।

অপর্ণা বললে—যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরই বাড়ি।

ডাক্তারবাবু একটু অবাকই হলেন কথাটায়, বললেন—তাই নাকি ! ওরা তাহলে বাড়িটা কিনেছে, বল।

মেয়ের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো, মুখ নীচু করে কোনক্রমে সে বললে—তাই হবে হয়ত।

এরপর কণাকে বললেন ডাক্তারবাবু—ঠিক আছে মা, রাতটা ত কাটুক, কাল যা হয় হবে। না হয় আমি নিজেই যাবো তোমার জ্যোঠামশাইয়ের কাছে, তোমাদের তুজনকে নিয়ে।

কণা কোনো উত্তর দিলো না।

বাইরের ঘরেই শোবার বন্দোবস্ত হলো অনুপমের, কণা রইল অপর্ণার কাছে।

ডাক্তারবাবু শুয়েছেন গিয়ে নিজের ঘরে, মায়া অনিমেষের ঘরেও আলো নিভল, চারদিক নিশুতি হয়ে গেল। আকাশে মেঘসঞ্চার হয়ে আবার বৃষ্টি নামল ঝম্‌ঝম্ করে। আবার শুরু হলো তুম্‌দাম্ করে জানালা বন্ধ করার পালা।

আবার সব চুপ। শুধু অপর্ণার ঘরেই দেখা গেল দুই বন্ধুর চোখে ঘুম নেই! অপর্ণা ঠাট্টা করে বললে—তোর অনুপম ঘুমিয়েছে ত?

—কী করে জানব?

ঠোঁট টিপে হাসল অপর্ণা বললে—কী মনে হয়?

—ওমা, ঘুমুবে না কেন? আর ভাবনার কী আছে?

—তা বটে।—অপর্ণা বললে—সকাল হলেই ভাবনা গুলো যখন মুর্তি পরিগ্রহ করে দরজায় এসে দাঁড়াবে তখন দেখা যাবে, তোমরা কে কতো নিশ্চিন্ত।

কণিকা ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললে—কেউ কিছু করতে পারবে না! আস্মুক না শোভা, দেখি কেমন ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওকে!

—ঈস্, খুব শক্তিমতী যে!—অপর্ণা পরিহাসের সুরে বললে-- শোভা আসবে কেন? শোভার মা আসবে, ভাবী জামাইকে তিনিই তো চাকরী করে দিয়েছেন?

—ও চাকরী ও করবে না!—কণা বললে,—আমাদের কথা হয়ে গেছে। আমি করতে দেবো না ও চাকরী।

—তারপর?

কণা বললে—তারপরে দেখা যাবে'খন। নে বাপু, আর বকবক করতে পারি না, এখন ঘুমুতে দে।

—ঈস্! ঘুমুতে দেবে! ওঠ ছুঁড়ি! সারারাত গল্প কর শুয়ে শুয়ে। সকাল হলেই ত পালাবি আর কতদিনে দেখা হবে কে জানে?

বলতে বলতে ওর গলা বোধহয় একটু ধরে এলো। আর সেটা বুঝতে পেরেই কণা কাছে টেনে নিলো ওকে, বললে—ঠিক আছে সারা রাতই আজ জাগব, কিন্তু একটা কথা দে।

—কী কথা?

কণা বললে—তোর সব কথা আমাকে বলবি ?

—আমার আবার সব কথা কী ?

—বলবি না ?

—কী বলব, বল ?

কণা উঠে বসল,—বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে তোর ভাবের কথাটা ?

পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল অপর্ণা, কোনো কথা বলল না।

কী একটা অনুভব করে কণিকা ঝুঁকে পড়ল ওর মুখের ওপর। খাটের নীচে লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখা আছে। তার ক্ষীণ আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু অনুভবে বুঝতে পারল কণিকা, অপর্ণার চোখদুটি জলে ভরে এসেছে।

কণিকা সবিস্ময়ে বলে উঠল—একী রে, চোখে জল !

—না না !—বলতে বলতে উঠে বসল অপর্ণা।

কণা বললে—লক্ষ্মীটি ভাই, কী হয়েছে আমাকে বল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে ?

—না না, তা হবে কেন ?

—তবে ?

অপর্ণা নিরুত্তর। কণা বললে—ঝগড়া হয়েছে বুঝি ? ও কিছু নয়, দুদিনে মিটে যাবে।

অপর্ণা মুখ নীচু করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিলো বোধহয়। ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল—তোকে আর অনুপমবাবুকে দেখে বড়ো ভালো লেগেছে। তোরা সার্থক হ, এই প্রার্থনা করি।

—কিন্তু, তোর কী হয়েছে ? বলবি না ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপর্ণা বললে—বলব। তোকে বলব না ? কিন্তু, আজই কেন শুনতে চাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ, আজই শুনব।

একটুক্ষণ থেমে থাকবার পর অপর্ণা বললে—কলকাতায়

আমার এক বন্ধু আছে, জানিস? এই ঠিক তোর মতো। নাম—মিনতি। আমার থেকে বয়সে একটু বড়ো, মিনুদি বলে ডাকতাম। বিয়ে হয়েছে কলকাতার কাছে—কাশীপুরে। ওর বর কাজ করে কাশীপুরে এক কারখানায়।

—ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করলি যে? তোর মিনুদির কথা শুনতে চাইছে কে? বিশ্বনাথবাবুর কথা বল না? কবে আলাপ হলো? কী করে আলাপ হলো?

অপর্ণা বললে—সে সব কথা বলতে গেলে মিনুদির কথাও এসে পড়ে যে! আচ্ছা, তুই প্রথম থেকেই শোন।—মিনুদির বিয়ের পর ওর আর চিঠি নেই। অথচ, চিঠি লিখতে মিনুদি ওস্তাদ। তাই রাগ করে আমিই চিঠি দিলাম আগে! চিঠিতে—কী খেয়াল হলো—তোদের বিশ্বনাথবাবুর কথা সব লিখে ফেললাম ইনিয়ে-বিনিয়ে। আর, সেই লেখাই হলো কাল।

—মানে!

—সবটা শোন।—অপর্ণা বলতে লাগল—নতুন এখানে এসেছি। একদিন হয়েছে কী, সেই প্রথম যখন কার্মাটাড়ে এলাম, তখনকার কথা। জানালার কাছে বসে চুল বাঁধছি, এমন সময় বৌদিটা এসে কী বললে জানিস? বললে—অপর্ণা, দেখি তোর ক্ষমতা, একটা কাজ করতে পারবি?

—কী কাজ?

মুখ টিপে-টিপে হাসছিল, বললে—রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ।

দেখলাম। এই যে ঘরটা না? এর পূবের জানালাগুলো খুললেই একটা আতা গাছ দেখতে পাবি। দেখেছিস কখনো?

কণা বললে—কে জানে! দেখেছি হয়ত!

—ছাই দেখেছিস! জ্যেঠামশাইয়ের দুর্গ থেকে বেরিয়েছিস কবে, যে দেখবি? বৃষ্টি হচ্ছে, নইলে জানালা খুলে তোকে দেখাতাম। আসল কথা, জানালার ধারে গাছটা থাকায় সুবিধা

হয়েছে এই, বাইরে থেকে কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে না, জানালার ভিতরের দিকে কেউ আছে কিনা ; অথচ, ভিতরের লোকের ভারী সুবিধা,—সে ভিতর থেকে বাইরের সব কিছু দেখতে পায় !

বৌদির কথায় চট্ করে বাইরের রাস্তায় তাকিয়েই মুখ ফেরালাম বৌদির দিকে, বললাম—দেখলাম ত, হলো কী ?

বললে—ঐ যে পায়চারী করছে ছেলেটা দেখছিস, উদাস-উদাস ভাব ?

আবার দেখলাম। সত্যিই একজন ঘুর ঘুর করছিল পায়ে চলা পথটার ওপর। আজই শুধু নয়, বেশ কয়েকদিন ধরে দেখছি, এই রাস্তাটা দিয়ে প্রায়ই যায়-আসে। কাছেই একটা বাড়িতে বুঝি হাওয়া-বদল করতে এসেছে।

বৌদি দুষ্টুমির হাসি হাসতে হাসতে বললে—দেখি ক্ষমতা, ওকে তোর প্রেমে পড়াতে পারিস ?

সত্যি বলছি কণা, হাসতে হাসতে আমার দম ফেটে যাবার উপক্রম হলো। ঐ তো ভারী একটি ছেলে, তার নাকে দড়ি দিতে দরকার হয় আবার ক্ষমতা! বৌদি আচ্ছা হাসিয়েছে যাহোক।

ওর দোষই বা কী, ও ত আর জানেনা, এদিকে ভেতরে ভেতরে কী লীলা চলছে!

আমি প্রায়ই সকালে বিকেলে এখানে বসে গুনগুনিয়ে গান গাই ত—বোধ হয় কানে গেছে কোনক্রমে, সেই থেকে সত্যি বলছি ভাই, রোজ বিকেল বেলা—ঠিক এইখান দিয়ে হেঁটে যাওয়া চাই! আমি নিজের মনেই হাসতাম, আর ভাবতাম,—মরেছে ছেলেটা!

বৌদি বলল—আ মর, হেসেই অস্থির!

—হাসব না ? ঐ ত ভারী একটা ছেলে!

—তোর দাদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ছেলেটির, তোর দাদা তো যাকে বলে মুগ্ধ!…ওকি হাসছিস যে আবার ?

হাসতে হাসতে বললাম—ছেলেটা কী চালাক! অন্দরে প্রবেশ করবার পথ খুঁজছে!

বৌদিও হাসল, বলল,—তোর দাদা বলে, ও সব ছেলের মধ্যে নাকি মোহ বলে কোন জিনিস নেই!

—কেন ছেলেটি কী একেবারে—

—কে জানে কী! তোর দাদা জিজ্ঞাসা করেছিল,—আপনি কী করেন? উত্তরে বলেছিল, কিছুই বিশেষ করি না, তবে পৈতৃক কিছু আছে, তাই নিয়ে কোনক্রমে পথ চলছি!—এই রকম আরও কী সব মাথা মুণ্ডু!

বলেছিলাম—বুঝেছি, দাদা এই কথাবার্তা শুনেই মজে গেছে। হায় রে কপাল, আজকালকার ঐ শিকারী ছেলেগুলোকে দাদা চেনে না ত! ওরা গোটাকয়েক মানানসই কথা মুখস্থ রাখে, আর সুযোগ বুঝে ফেলে টোপ। দুদিন বাদে শুনবে, বলছে—আমি কবিতা লিখি! ওরা মনে করে, দু'টি কবিতা লিখেই মেয়েদের মন জয় করবে! কেউ কেউ শিখে রাখে আবার খানকয়েক বাছাবাছা ন্যাকামীর গান! আরে বাপু, মেয়েরা কী এতই বোকা, যে, তোমাদের ছলাকলা কিছুই বুঝতে পারবে না?

বৌদি শুনে বললে—সাবাস, পুরুষ চরিত্র অনুধাবনে আমাকেও হার মানালি পর্ণা।

হেসে বললাম,—দেখলেই বোঝা যায় কে কেমন ছেলে। আচ্ছা বৌদি, ওর নামটা কী, দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছো?

বৌদি বললে—করেছি বই কী, নাম হচ্ছে বিশ্বনাথ ব্যানার্জী। বামুন। আমরাও বামুন, ব্যাপারটা যদি অনেক দূর গড়িয়েও যায় ভাববার কিছু নেই, পালটী ঘর, অনায়াসেই বিয়ে হতে পারবে।

রেগে গিয়ে বললেন—আঃ, বৌদি! তুমি কী ক্ষেপেছ! আমি বিয়ে করব ঐ লোকটাকে? ঐ মেয়ে শিকারী ছেলেটা হবে আমার

স্বামী? তার চেয়ে গলায় দড়ি যে অনেক ভালো। জানো ঐ বিশ্বনাথের কাণ্ড?

এক এক করে সবই বললাম বৌদিকে।

শুনে হেসে ফেলে বৌদি বললে,—এতো কাণ্ড! আর তুই কিচ্ছু জানাস নি! তোর দাদা ওকে আবার চায়ে নিমন্ত্রণ করেছে যে!

তারপরে ভাই,—চায়ের নিমন্ত্রণে লোকটির সঙ্গে বেশ করে আলাপ করলাম। কী বলব ভাই, সব কথা বলতে আমারই লজ্জা করছে। আমি গাইলাম, সে কী প্রশংসা!

এর কিছুদিন পরে, একদিন সরাসরি বাড়ির মধ্যে এসে হাজির। বললে,—দাদা আছেন?

আমি তো হেসে বাঁচিনে—একেবারে দাদা! যতদূর সম্ভব মুখের ভাব স্বাভাবিক করে বললাম,—দাদা বাইরে গেছে, এখ্খুনি আসবে। আপনি আসুন, বসবেন।

বলব কী ভাই, ভদ্রলোক বিনা দ্বিধায় ঘরের মধ্যে এসে বসলেন। মনে মনে ভাবলাম, দাদা ত আজ শীগ্গির আসছে না, —একটু মজা করলে হয় না একে নিয়ে? বললাম,—আপনি এলেন, কত সৌভাগ্য আমাদের! আপনি বসুন, আমি চা করে নিয়ে আসছি।

চা করতে রান্নাঘরে এসে বৌদিতে আমাতে হেসে হেসে অস্থির! শেষকালে মুখে আঁচল গুঁজতে হলো, কী জানি, লোকটা যদি শুনতে পায়! বৌদিকে বললাম, একা একা বসে আছে, কী মনে করবে? তুমি যাও, আমি চা করছি।

—আহা, ন্যাকা! নিজেই যা না, ভয় করছে নাকি?

বাধ্য হয়ে নিজেকেই যেতে হলো। যাবার আগে একটা কাজ করলাম। একটু আগেই গা ধুয়েছিলাম, পরণের সাড়ীটা বদলে নিলাম, আর কপালে পরলাম একটা কালো টিপ। ঘরে ঢুকে দেখি, কী একটা পত্রিকা টেনে নিয়ে ভদ্রলোক

পাতা ওলটাচ্ছে। আমাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, বললে,—বসুন?

কিন্তু বসলাম না। যাই বল ভাই, ব্যাটাছেলেদের চোখের সামনে বসে থাকতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। যাই হোক, ভদ্রলোক আর অনুরোধ করলেন না, পত্রিকার পাতা যেমন ওলটাচ্ছিলেন তেমনি ওলটাতে লাগলেন। দেখলাম, লোকটি একটু লাজুক লাজুক। সেদিন কী মনে হয়েছিল জানিস? মনে হয়েছিল, ওটা ওদের পোজ, মেয়েদের সামনে ওরা ভাল মানুষটি সেজে থাকে, ভাবে ঐতেই বুঝি গলে জল হয়ে যাব আমরা! হেসে বললাম,—এখানে কী আপনি একাই এসেছেন?

—না।

—কে কে আছেন আপনার বাড়িতে?

—মা।

—আর।

—আত্মীয় স্বজন অনেকে আছেন, তবে তাদের সঙ্গে আমার ঠিক খাপ খায় না।

ভাই কণা, সেদিন খাঁটি অভিনয় করেছিলাম আমি। তাই কণ্ঠস্বর যাকে বলে সুধামিশ্রিত করে বললাম—বলুন না, বিশ্বনাথদা, আপনার কথা শুনতে আমার এত ইচ্ছে করে···

এই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে,—বাঃ। আপনার মুখে দাদা সম্বোধন ভারী সুন্দর শোনালো ত! যাক, আজ থেকে দাদার অধিকার পাওয়া গেল।

হাসলাম শুধু, কিছু বললাম না।

ভদ্রলোক একমনে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখছে! সেদিন মনে হয়েছিল, এ-ও এক ধরণ! দেখে মনে হয় কত গম্ভীর, কত উদাস, কত নিস্পৃহ! কিন্তু যারা ওদের চেনে তারা বলবে, ওটা ওদের মস্ত বড় একটা পোজ। অর্থাৎ মেয়েদের মনে দাগ

ফেলবার উদ্দেশ্যে এটা একটা অত্যন্ত ধারালো তীর নিক্ষেপ বলা যায়। সেদিন তাই মনে হয়েছিল। যাই হোক, অভিনয় করতে যখন নেমেছি, তখন ওগুলি সেদিন উপেক্ষা করতে পারি নি। বললাম,—দেখছেন কী একমনে ?

—আকাশ। রঙের ওপর রঙ তুলে কে যেন সলজ্জ হাসির রেখা এঁকেছে, দেখেছেন ?

—আকাশই খালি চোখে পড়ে ?

—না আকাশের ছায়া দেখছি মাটির ওপরে। আর দেখছি আপনাকে, গোধূলির আগুন আপনারও মুখে শিখা জ্বালিয়েছে !

কী ভাই, আরও শুনতে চাস ?

এর পরে দিন কয়েক আমি একেবারে গা-ঢাকা দিলুম। আর বলব কী ভাই, ভদ্রলোকের সে যা অবস্থা ! দাদার সঙ্গে ঘরে এসে বসে, কিন্তু চোখ দুটি সর্বদাই কি-যেন খুঁজে বেড়ায় ! আমি আর বৌদি আড়ালে মুখে আঁচল গুঁজে হেসে হেসে মরি।

কিন্তু না ভাই, বাহাদুরীও ছিল ছেলেটির।

ক্রমে ক্রমে আমার মনে তখন একটা ভয় ঢুকল। যে রকম ছেলে, যদি সরাসরি দাদার কাছে বিয়ের কথা বলে বসে ! তাই, দিনকতক ভয়ানক ভাবনায় পড়লাম। দাদা-বৌদিরও ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল। মুখে ঐ সব বলে ভেতরে ভেতরে বিয়ের ষড়যন্ত্রই হচ্ছে কিনা কে জানে ! মোট কথা, এমন অবস্থাই লোকটা করে ফেলেছে যাতে করে বিয়ের কথা তুললে, দাদা-বৌদি যে বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, এমন ত বোধ হয় না ! আর দাদা-বৌদির মত হলে আমার সদাশিব বাবা আর কী করবেন ? ওঁদের মতেই ত তাঁর মত ! আমার মতামত কী আর শুনবেন ? তাই মনে মনে ঠিক করলাম—যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, এখন শক্ত হতে হবে একটু।

শক্ত হলাম ঠিকই, কিন্তু ঘটনাচক্রে এমনই শক্ত হতে হলো

যে, সেই ঘটনার পর নিজের মনেই একটু যেন কেমন-কেমন ঠেকেছিল, মনে মনেই বলেছিলাম—তাইত! অতটা না করলেই হতো। কিন্তু সেদিন কিছু করার ছিল না, সেদিন লোকটা যে অত দুঃসাহসী হয়ে উঠবে, তা কে জানত?

সেদিনকার কথাটাই তাহলে শোন। সন্ধ্যা হয়েছে সবে। বাড়িতে আমি একা। দাদা-বৌদি দুজনেই গেছে রাত মোহানায় বেড়াতে। বাবা কলে-এ বাইরে গেছেন।

ও এলো। আমি আর কী করি, বসতে বললাম। কিন্তু সেটাকেই যে ও প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত বলে ধরে নেবে, কে জানত? কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে গল্প করছিলাম। কিন্তু তাই কী অত সাহসী হয়ে উঠবার কারণ ঘটেছিল?

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপারে কিন্তু লোকটার উপর আমার একটু শ্রদ্ধা জেগেছিল। দেখেছিলাম, লোকটি একটু চাপা। সাধারণত এ ধরণের ছেলেরা চাপা হয় না, তারা বরঞ্চ আরও বেশী করে নিজেকে প্রচার করে! যাই হোক আগের কথায় ফিরে আসি,—কথার পর কথায় হঠাৎ কখন বলে ফেলেছি,—আচ্ছা বিশ্বনাথদা, আপনি কী রকম মেয়ে সব থেকে বেশী পছন্দ করেন?

—সত্যি বলব?

—বলুন!

—ঠিক তোমার মত। এমনি হাসি-উজ্জ্বল সোনার মতো মেয়ে!

তারপরেই শুনলাম সেই দুঃসাহসিক কণ্ঠ,—তোমার মধ্যে যেন আর একজন কাকে আমি দেখতে পাই! সেই জন্যই ত ভালবাসি তোমাকে!—

এতটা চমকে গিয়েছিলাম যে বলার নয়, হঠাৎ দেখি একখানা হাত রয়েছে ওর হাতের মুঠোয়। হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

তারপর কী করেছিলাম সে আজ আর তোর শুনে কাজ নেই।

হ্যাঁ, যা ভাবছিস ঠিক তাই; সোজা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কণিকা রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল—তারপর?

দুইদিন পরেই শুনলাম, ভদ্রলোক নাকি চলে গেছে।

সেদিন মনে কোনো অনুশোচনা জাগে নি। মনে হয়েছিল, যতগুলি ছেলে দেখলাম সবগুলিই নগণ্য। এমন একটিও কী আসতে নেই, যাকে অন্তরের সমস্ত কিছু উজার করে ঢেলে দিয়েও মন তৃপ্তি পাবে না, আরও কিছু দিতে ইচ্ছা করবে?

কণিকা উত্তেজনায় একেবারে উঠে বসেছে সোজা হয়ে। বললে—ভারী অদ্ভুত ত! তারপরে? আবার ফিরে পেলি কী করে বিশ্বনাথবাবুকে?

অর্পণা বললে—ফিরে কি পেয়েছি? কে জানে? তার পরে শোন। এই সমস্ত কথা মনের খেয়ালে লিখেছিলাম মিনুদিকে। কিন্তু, তার উত্তরে মিনুদি আবার যে কাহিনী শোনালে, তাতে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে উপায় নেই। কী লিখেছিল শুনবি? তুই নিজেই পড়ে দেখ।

বলে, বিছানা ছেড়ে উঠল অপর্ণা। নীচে নেমে আলোর শিসটা বাড়িয়ে দিলো। তারপরে চাবি দিয়ে বাক্স খুলে নিয়ে এলো সেই চিঠিটা।

লণ্ঠনের আলোর সামনে মেলে ধরে সে চিঠি পড়তে লাগল কণা। পড়তে পড়তে আগ্রহ তার ক্রমশই বেড়ে গেল।

চিঠিটা হলো এই,—ভাই পর্ণা, তোর চিঠির উত্তর দিতে কিছু দেরী হলো। মনে কিছু করিস না। বার বার তোর চিঠিটা পড়েছি আর মনে হয়েছে, একী অশ্রুতপূর্ব কাহিনী শুনছি!

বিয়ের আগে আজকাল মেয়েদের জীবনে অল্পবিস্তর এসব ঘটেই, যদিও সুদীর্ঘ জীবনের পথচলায় তার মূল্য সাধারণত খুবই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই সব ঘটনার মধ্য থেকে এক একটি ঘটনা

এমনি অত্যাশ্চর্য, যা চির জীবনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। এই রকমই একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা আজ তোকে শোনাতে ইচ্ছা করছে, যা আমার জীবনের আকাশে সূর্যের মত ভাস্বর—দেদীপ্যমান। কী বলব ভাই, পাছে তোরা ভুল বুঝিস্, সেইজন্য তুই যখন কাছে ছিলি তখন তোকে বলিনি, তখন চোরের মত লুকিয়ে রেখেছি আমার সেই অমূল্য সম্পদকে।

তোর চিঠি পড়তে পড়তে আমার সেই স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠছে। তুই কী পেয়েছিস, আর আমি কী পেয়েছিলাম একবার তুলনা করে দেখ। ওঁর আজ নাইট ডিউটি সুতরাং ঘরে আমি একা। এখন রাত অনেক, চারদিক নিঃঝুম। ঘুম আসছে কিন্তু না, আজ ঘুম নয়, এই চিঠির কয়েকটি পংক্তির মধ্যে তাঁকে এঁকে রাখতে চেষ্টা করব আজ।

তাঁকে সম্বোধন করি আমি 'দাদা' বলে। হ্যাঁ তিনি আমার দাদা—আমার গুরু, আমার পূজনীয়। আমি তাঁর বোন, তাঁর শিষ্যা!

তুই তখন এখানে, কিন্তু তাঁকে তুই চিনতিস না, দেখিসও নি কোনদিন, আর আমিও তাঁকে লুকিয়ে চলতাম তোদের কাছ থেকে, পাছে তোরা কেড়ে নিস!

আমাদের সংসার তুই তো জানতিস। আমরা ছিলাম মাত্র দুটি প্রাণী,—আমি আর বাবা! বাবা ভয়ানক ভালবাসতেন তাঁকে। এ বাড়িতে তাঁরও ছিল অবারিত দ্বার।

তিনি যে কোথায় থাকতেন—কী করতেন, জানি না, কোনদিন জানতেও দেন নি। কখন যে আসতেন—কখন যে যেতেন তারও কোন ঠিক ছিল না,—ভয়ানক খেয়ালী।

আমি যে কবে কেমন ভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, স্পষ্ট মনে নেই। কিছু মনে করতে গেলেই অনেকগুলি ঘটনার ভীড় আসে। তাঁকে যে পাবো না, এ আমি জানতাম মনে মনে।

কিন্তু জেনেও ধীরে ধীরে কাঙালের মতো সেই আমার রাজ-রাজ্যেশ্বরের কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিলাম একদিন।

বহুদিন পরে এক রাত্রে তিনি এলেন। হাতে তাঁর ছিল একটা ফাইল, সেটা যখনই আসতেন তখনই তাঁর হাতে দেখেছি! ওর মধ্যে থাকত পেন্সিলে আঁকা কতকগুলি অসমাপ্ত ছবি। বলতে ভুলে গেছি ভাই পর্ণা, তিনি চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন। ফাইলটা দিয়ে আমার মাথায় মৃদু আঘাত করে বলতেন, নে ধর। আর কী কী রান্না করেছিস বের কর, পেটে আগুন জ্বলছে।

তিনি যেদিন আসতেন, বাড়িতে একটা উৎসবের ঘটা পড়ে যেত। ওপর থেকে বাবা নেমে আসতেন, তাঁর যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য বাবা নিজে থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর ঘরে ঢুকতেই তিনি বলতেন, কণা তোর সঙ্গে আজ আমার ভীষণ দরকার। ফ্লাস লাইটের সামনে ঘাটের ওপর বোস ত।

—ওমা কেন!

—একটা ছবি আঁকবার দরকার আছে।

তোরা হলে কী করতিস জানি না, কিন্তু আমি তো ওঁকে চিনি, তাই সেই অত রাত্রে একা ঘরের ভিতর আমি একটুও সঙ্কুচিত হতাম না। ঠিক গিয়ে বসতাম। উনি বলতেন,—আজ রাস্তায় একটি চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়েছে, তাই থেকে এ জিনিষ আঁকবার আইডিয়া পেয়েছি। এক ভিখারী মেয়ে আর তার শিশু।

—মাগো, শেষ কালে আমাকেই সেই ভিখারিণী করবে নাকি?

বললেন—ভিখারিণী ত আঁকতে আমি চাইনি, আমি আঁকতে চেয়েছি—মা! নে, আর দেরী করিস না, ভালো করে বোস!

ভেবে দেখ পর্ণা আমার অবস্থাটা। এমন পরিস্থিতিতে কোনদিন কী পড়েছিস তোরা?

বললাম,—এই ত বসেছি।

—ও রকম করে নয়। মা যেমন বসে ছেলে কোলে নিয়ে।

আমার হলো, সমস্যা!

কী করে ওকে বোঝাই, ও আমাকে দিয়ে হবে না, আমি কী মা হয়েছি কোনদিন?

কুমারী মেয়েকে উনি মা সাজাবেন! ওর মতো ভোলা মহেশ্বর জগতে যদি তু'টি থেকে থাকে!

—হ্যাঁ, এইবার অনেকটা হয়েছে। ঘাড়টা আর একটু কাৎ কর। আঃ! চোখ ওদিকে কেন? দাঁড়া, ঘোমটাটা টেনে দিই।

আমার লজ্জা বুঝবেন না, ওঁর মতো করে উনি জোর করে সাজিয়ে নেবেনই! কাছে এসে ধমক টমক দিয়ে ঠিক আঁচলটা তুলে দিলেন মাথায়। এমন লজ্জা করছিল! তবুও মুখ ফেরাবার জো নেই, প্রচণ্ড ধমক খেতে হবে আবার।

—বাঃ! চমৎকার দেখাচ্ছে ত তোকে! আঃ! মুখ নামাস নি—

সামনে একটা চেয়ার আর ছোট্ট একটা টিপয় টেনে নিয়ে বসলেন। খুললেন ফাইলটা।

—বেশীক্ষণ বসতে হবে না, পেন্সিল-স্কেচটা করেই ছেড়ে দেবো।

এর পরে কয়েক মিনিট একবার আমার দিকে, আরেকবার খাতার দিকে, এইভাবে কেটে গেল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ কী ভেবে এক সময় মুখ তুলে দেখি, দরজার গোড়ায় বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন। আর যাবে কোথায়! সমস্ত ফেলে ছড়িয়ে বিছানার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেললাম!

বাবা সহাস্যে বলে উঠলেন,—তোর আর লজ্জা করতে হবে না, এই আমি চলে যাচ্ছি।

—বলুন ত মেসোমশায়, বলুন ত!

—ও একটা পাগলী। তা তুমি এঁকে যাও, আমি গেলেই ও ঠিক হয়ে যাবে!

বাবা চলে গেলেন। ওপরের সিঁড়িতে তাঁর খড়মের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। উনি এতক্ষণে কাছে এসে ভয়ানক সাধাসাধি আরম্ভ করেছেন।

—আর একটুখানি, কাঁটায় কাঁটায় মাত্র একমিনিট।

কিন্তু আমায় ওঠায় কার সাধ্য? বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পড়ে টের পেলাম, হাল ছেড়ে দিয়ে শেষকালে খাতাপত্র গুছিয়ে রাখছেন!

কয়েকটি মুহূর্ত বেশ কেটে গেল। একসময় কাছে এলেন, বললেন,—এবার ওঠ, নিজের বিছানায় যা, আমি শোবো ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

—উঠব না।

—লক্ষ্মীটি! এই দেখ, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

—তার আমি জানি কী!

আচ্ছা বেশ, না-ই উঠলি, দেখ আমি শুতে পারি কি না।

এই বলে একটা পাশবালিশ, আর একটা মাথার বালিশ টেনে নিয়ে দুম্‌দাম্‌ মেঝেতে ফেললেন। তার পর দরজাটা দিলেন ভেজিয়ে, জানালা খোলাই ছিল, আলো দিলেন নিভিয়ে, জ্যোৎস্না এসে সমস্ত ঘর ভরে ফেলল। তারপর ভাই অবাক কাণ্ড, সেই খালি মেঝের ওপরে দেখতে দেখতে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষকালে আমিই অপ্রস্তুত!

কিন্তু এতেও কী হুঁস আছে? পরদিন যখন বেরিয়ে এলেন তখন বেলা তিনটে! না খাওয়া, না স্নান, সে যা অবস্থা হয়েছে, তা দেখলে কান্না আসে। অথচ এমন মানুষ, দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়েছি, একটুও চৈতন্য নেই। একটা কাগজ হাতে দিয়ে

বললেন,—তোকে দিলাম। আর, আমি স্নান করতে যাচ্ছি, যাহোক কিছু খেতে দে, পেট জ্বলছে।

দেখলাম ছবিখানা। সে যে কী অপরূপ তা না দেখলে বোঝানো যায় না। একটি চমৎকার ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে আমি বসে আছি. আমার দৃষ্টি, আমার মুখশ্রী এত কমনীয়, এত মাধুর্যমণ্ডিত করে তুললে কে? যেন চমৎকার একটা সুরের ঝংকার হয়ে বাজতে লাগলাম সারাদিন—আমি মা—আমি মা!

আরও কী শুনতে চাস পর্ণা? আরও একটা দিনের কথা তাহলে শোন। এই দিনটা আমার জীবনের পৃষ্ঠায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কোথা থেকে উনি এলেন। বললেন—ভুল পথ ধরেছিলাম রে! বাহ্যিক রূপটার মূল্য আর্টের কাছে কতটুকু? সত্যকার রূপ রয়েছে অন্তরে, যেখান থেকে নিয়ত তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

—কী হল?

—কী তফাৎ রইল ফটোগ্রাফীর সঙ্গে আর্টের তাহলে? জড়জগতের ছবি এঁকে চলেছি, কিন্তু মূল্য তার কতটুকু? দেখে এলাম কলার্ড ফটোগ্রাফীর নিদর্শন, এই শ্রেণীর রূপচর্চার সঙ্গে কোথায় তার তফাৎ?

—আগে বিশ্রাম নাও দেখি, পরে বক্তৃতা হবে'খন।

—এই যে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছিস. এইটাই কী তোর ছবি? তা নয়। ঐ যে তোর চোখে জ্যোতি, সমস্ত মুখ ভরে কেমন একটা বিভা, এর সত্য আরও গভীর। এগুলি কী ধরতে পারবে ফটোগ্রাফী? না একমাত্র আর্টিস্টই বলতে পারবে—তোমার মধ্যে দেখছি আমার সেই পরমাশ্চর্যকে! তোমার লীলায়, তোমার ভঙ্গীমায় দেখছি সেই পরম রূপকারেরই প্রকাশ।

—এখন এসব রেখে খাবে এসো।

কিন্তু খেতে বসেও কী নিস্তার আছে? কী যে হয়েছে ওঁর,

মুখে যেন খই ফুটে চলেছে সর্বক্ষণ! শেষকালে খাওয়ার পর বললেন, নাঃ, আর বকবকানি ভালো লাগছে না। বারান্দায় ইজি-চেয়ারটা আছে না? ওখানে শুয়েই আজ রাত কাটাবো। একটা চাদর দিস ত, গায়ে দেবার।

কোনও প্রতিবাদ খাটে না ওঁর কাছে, সে কথা ভালভাবেই জানি, সুতরাং ওঁর নির্দেশ পালন করে চললাম।

অনেক রাত! বিছানায় ছটফট করছি, ঘুম আসছে না। এক সময় উঠে গেলাম বারান্দায়। শুয়ে আছেন, ম্লান জ্যোৎস্না ওঁর চারদিকে যেন একটা স্বপ্নের জাল বুনে রেখেছে! খুব কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

বললাম—ঘুমিয়েছ?

—না! কিন্তু তুই যে উঠে এলি বড়?

—বেশ করেছি উঠে এসেছি, তোমার তাতে কী?

আমার মাথায় হাতখানা রাখলেন, বললেন,—তোর কী হয়েছে রে মিনু?

—কী হয়েছে সে কী তুমি বুঝবে? পাষাণেরও হৃদয় আছে, তোমার তাও নেই।

—বলছিস কী?

—তুমি নিষ্ঠুর তাই কিছু বোঝনা।

না পর্ণা, আজ আর কোন দ্বিধা নয়, সব তোকে জানাব। আর পারলাম না বেঁধে রাখতে নিজেকে। ওঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হু-হু করে কেঁদে ফেললাম,—নিষ্ঠুর তুমি—নিষ্ঠুর!

ধীরে, অতি ধীরে তিনি বলতে লাগলেন,—না মিনু, নিষ্ঠুর আমি নই, আমারও প্রাণ আছে। যে দান তোর কাছে পাচ্ছি তা আমাকে ঋণী করে রাখছে। তুই কী বুঝিস না, এতলোক থাকতে কেন শুধু তোর কাছেই ছুটে আসি!……নে ওঠ, ছেলেমানুষী

করিস না, কী করবি আমাকে নিয়ে, তুনিয়ার—ভবঘুরে-পাগল লোক আমি!

কাঁদতে লাগলাম। তিনি সস্নেহে হাত ধরে নিজে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে এলেন আমাকে, কেবল বললেন,—লক্ষ্মীটি, অমন করছিস কেন, কাঁদবার কী হয়েছে?

আজ ভাবি তিনি কত মহৎ! এমন কী ভাগ্য করেছি যে তাঁকে পাবো। না, না তাঁকে তো পেয়েছি, তিনি আমার পরম সুহৃদ!

তারপরের দিন থেকে বাবার সঙ্গে কী সব পরামর্শ হতে লাগল। মাসখানেকের মধ্যেই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, হাতে শাঁখা সিঁথিতে সিঁতুর, স্বামীর ঘর করতে চলেছি।

স্বামী আমার দাদারই বন্ধু। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেখি, সেখানেও তিনি, হাসিমুখে খেটে চলেছেন। অষ্টমঙ্গলার দিন সন্ধ্যার পর আমি ছাদের আলসের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ধীর পায়ে দাদা কাছে এলেন।

—মিনু—

পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম! তিনি অতি স্নেহে তুলে ধরলেন আমাকে।—ভাই পর্ণা, কী বলব, আমি আর লিখতে পারছিনা, পরিষ্কার দেখলাম তাঁর চোখে জল!

বললেন—তুই যে আমার কতখানি হয়ে দাঁড়িয়েছিস তা ত জানিস না বোন। মাঝে মাঝে দাদাকে মনে করিস।

—দাদা?

—যার হাতে তোকে তুলে দিয়েছি, আশা করি সে তোকে সুখী করতে পারবে। তুই সুখী হ বোন, এইটুকুই প্রার্থনা।

ভাই পর্ণা, এইখানেই শেষ করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু না, আরও একটু আছে।

মাস নয়, বছর ঘুরে যাবারও পরে, হঠাৎ বহুদিন পরে এই

সেদিন তিনি আবার একবার এসেছিলেন। সেই বিদায় বেলায় যে রকম বিমর্ষ দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি বিমর্ষ।

অনেক কথাই হলো।

এক সময় বললেন,—ঋণ শোধ করে এলাম মনে হচ্ছে। এবার আমি মুক্ত। দেখ মিনু, একথা নিদারুণ সত্য, জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলাম—ঋণ শোধ কাকে বলছ তুমি?

বললেন—যদি বলি প্রেমের ঋণ? একজনের মন যদি আরেক-জনের জন্য মুহূর্তের জন্যও বিহ্বল হয়ে ওঠে, ত, তখুনি তার কাছে ঋণ রইল জমা হয়ে! মনের এ এক আশ্চর্য দিক, বুঝলি বোন? সত্যিই বলি, তোর কাছে ঋণ ছিল আমার। বেদনা দিয়ে, লাঞ্ছনা দিয়ে আজ তা শোধ করে এলাম।

কথাটা তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারিস নি পর্ণা, আমিও ঠিক পারি নি। কিন্তু, না পারলেও তাঁর মন যে কী এক ব্যথার আঘাতে রিন্‌রিন্ করে বেজে উঠল, সেটা বুঝতে ভুল হয় নি। তাই আর—কিছু প্রশ্ন করে তাঁকে বিড়ম্বিত করিনি।

তার পরেই তিনি চলে গেলেন। আমি নীরবে তাঁর পায়ে প্রণাম জানাতে পেরেছিলাম শুধু, আর কিছু নয়।

ভাই পর্ণা, আজকের মতো এইখানেই শেষ। প্রীতি গ্রহণ করিস। ইতি—মিনতি।

চিঠি থেকে মুখ তুলল কণা। বললে—আশ্চর্য চিঠি। তুই কিছু লিখেছিলি এরপর? চোখদুটি হঠাৎ ছলছল করে এলো অপর্ণার, কথা যখন বললে, বোঝা গেল গলাটাও ধরা ধরা।

বললে—লিখেছিলাম ভাই। লিখেছিলাম, আর মিনুদিও উত্তর দিয়েছিল। আর, সে-ই শেষ চিঠি, শেষ উত্তর।

—কী লিখেছিলি তুই?

অপর্ণা বললে—লিখেছিলাম, তুই যা পেয়েছিলি তার তুলনা মেলে না মিনুদি! ও রকম কেউ যদি আসতেন আমার জীবনে, তাহলে তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে চিরদিন পূজো করতাম! আরও শুনবি ভাই কণা? লিখেছিলাম. উনি কি বিয়ে করেছেন মিনুদি? তোর চিঠিতে মনে হলো, করেন নি। বড়ো জানতে ইচ্ছা করে! ওঁর নামটা কীরে?

কণা জিজ্ঞাসা করলে—তারপর? উত্তর পেয়েছিলি ত?

—হ্যাঁ।—বলে, অপর্ণা আগের চিঠিটা বাক্সে রেখে এলো, নিয়ে এলো আরেকটা চিঠি। খামেরই চিঠি, কিন্তু ক্ষুদ্রকায়।

বললে—এই নে, পড়ে দেখ।

কণা পড়তে লাগল লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয়,—

"ভাই পর্ণা. যাঁর কথা তুই জানতে চেয়েছিলি, তাঁর নাম হচ্ছে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিজের অহমিকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিলি বলে যাকে অতি কাছে পেয়েও তুই নিতে পারলি না, অবহেলায় হারালি। জীবনের একটা দিকই মানুষ দেখে, অন্য দিকটা দেখে না কেন?—ইতি—মিনতি।"

চিঠি পড়ার পর ওরা দুইবন্ধু বহুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না! ঘড়ীটা টিক্‌টিক্ করে আপন মনে সবসময়ই ত বেজে চলে। কিন্তু কাজের ভীড়ে, কথার আবেগে সেই বেজে চলার ধ্বনি কেউ শুনতে পায় না! সেদিনকার সেই নিশুতি রাত্রে, কথা হারিয়ে ফেলার পর দুজনেই একসঙ্গে শুনতে পেলো—কালের সেই পদধ্বনি! টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ করে প্রতিটি মুহূর্ত পার হয়ে চলেছে!

উঠে বসেছিল দুজনেই। এরপর আলোর শিখাটা যে কমিয়ে দিয়ে দুজনে আবার শুয়ে পড়বে, সেটাও বুঝি ভুলে গেছে ওরা! চোখের কোণে যদিও বা তন্দ্রা নামছিল, কিন্তু চিঠি পড়ার পর ছুটে গেছে নিদ্রার আমেজ!

কথা বলল শেষ পর্যন্ত কণিকাই প্রথম। অনুপমকে যেমন করে সে ফিরে পেলো, সেই ঘটনাগুলি মনশ্চক্ষে একবার দ্রুত অবলোকন করে নিয়ে বলল—কথাটা কিন্তু ঠিক। মানুষ যে মানুষকে কী ভাবে ভুল বোঝে, তার আর লেখাজোখা নেই। এবার বলনা ভাই, কেমন করে তুই আবার ফিরে পেলি বিশ্বনাথবাবুকে?

—কাল শুনিস, আজ বরং শুয়ে পড়।

—না ভাই, আজই বল। তোর জীবনেব ঘটনার আলোয় নিজের জীবনের ঘটনাকে দেখে নিচ্ছি যে! ঘুম এখন আসবে না।

একটু কাত হয়ে শুয়ে পড়ল অপর্ণা. তারপর গুছিয়ে সব বলতে গিয়ে ফিক্ করে হঠাৎ হেসে ফেলে লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে বলল—কেমনটা যেন হয়ে পড়েছিলাম তখন।

—কখন?

—যে ঘটনার কথা বললাম না? তার এক বছর পরের কথা বলছি। বৌদি গেল বাপের বাড়ি। বাপের বাড়িতে ওরও দাদা-বৌদি, বাপ আর মা। খুব ভালো মানুষ সবাই! বৌদির ছোট একটা ভাই আছে, সৌরেশ তার নাম, আমরা ডাকি সৌরেশদা বলে। কথা হলো, বৌদির সঙ্গে আমিও যাবো কলকাতায়। দাদা ত সাতদিনের ছুটি নিয়ে যাচ্ছে? সাতদিন পরে ফিরে আসবে, দাদার সঙ্গে আমিও চলে আসব, বৌদি থেকে যাবে আরও কিছুদিনের জন্য।

সব ব্যবস্থার কথা শুনে বৌদিকে মুখভার করে বললাম—বেশ বিলিবন্দোবস্ত করেছ! বাবা একা একা থাকবে! আর, বাবাকে একা ফেলে রেখে আমি কলকাতা যাবো?

—সাতদিনের জন্য ত মোটে!

—তা হলোই বা সাতদিন! বাবাকে দেখবে কে?

বৌদি কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বললে—ঠাকুর চাকর নেই বুঝি?—দেখিস লো দেখিস! এরপর যখন শাঁক বাজিয়ে উলু দিয়ে তোকে

সবাই কোনো এক অচেনা ডাকাতের হাতে তুলে দেবে, তখন বাপের ওপর কতটা দরদ উথলে উঠে, একবার দেখব!

—যাও!

বৌদি হেসে বললে—আসল কথা, বাবার আদেশেই এ সব ব্যবস্থা হয়েছে। কেন হয়েছে সেটা কলকাতা গেলেই বুঝতে পারবে।

পারলামও তাই। দাদার যে কী ভালোবাসা পড়েছিল লোকটির ওপরে কে জানে! খুঁজে পেতে ঠিক বার করল তাকে! আমি তখন মিনুদির সঙ্গে দেখা করতে যাবো মনে করেছি, দাদা এসে বৌদিকে বললে—পর্ণাকে আজ দেখতে আসবে বিকেলে।

—কে গো?

—বিশ্বনাথ।

বৌদির ভাই সৌরেশ কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সবই শুনেছিল সে বৌদির কাছ থেকে, এই কথায় একেবারে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

রাগ করে বলেছিলাম—অমন কোরো না সৌরেশদা, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!

কণিকা এই সময় আর থাকতে না পেরে বলে উঠল—তারপর?

অপর্ণা ফিক্ করে আবার হেসে ফেলল। বলল—ওর কাছ থেকে পরে শুনেছি, আমাদের বাড়ির দিকে ও রওনা হয়েছে, বাড়ির কাছাকাছি এসেছে, এমন সময়, জুতোয় পেরেক ফুটে উঠল!

—পেরেক!

—হ্যাঁরে।

দুজনে মুখে আঁচল গুঁজে চাপা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

অপর্ণা বললে—সে বড়ো হাসির কথা। আমাকে পরে সব বলেছে। বলেছে—তোমাদের বাড়ি আসছি ত? মনে মনে ঠিক করে এসেছি, বিয়ের প্রস্তাব যদি হয়, ত, না বলব।

কণা বলে উঠল—বিয়ের প্রস্তাব হয়, মানে ?

—দাদার কাণ্ড ত ? ওকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে এসেছে। মনে মনে স্থির করেছে, বিয়ের প্রস্তাব করবে কিন্তু মুখে কিছু বলেনি। ও অবশ্যি ভিতরে ভিতরে টের পেয়েছিল সব! আমাকে বললে কী জানিস ? বললে—ঠিক করে গিয়েছিলাম, বলব,—আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার বোনের যোগ্যতর পাত্র আপনি নিশ্চয় পাবেন।

কণিকা বললে—কেন! একথা কেন ?

অপর্ণা আবার একটু হাসল, বললে—ওর যে আমার ওপর রাগ হয়েছিল! বাবু তখন চাকরী করছেন, গুমোরে আর মাটিতে পা পড়ে না আর কী!

—তারপর ?

—তারপরে আর কী, আমাদের দরজায় এসে ত কড়া নাড়ল। সৌরেশদা ত চিনত না, দরজা খুলেই দেখে সিল্কের পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক। সৌরেশদা এক আপনভোলা শিল্পীর কথা শুনেছিল, তাই ভদ্রলোককে দেখে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়। শিল্পী যে আবার মনের খেয়ালে বাবু সেজে আসবে, এটা সে বুঝবে কী করে ?

তাই সে প্রশ্ন করেছিল—কাকে চান ?

ভদ্রলোক বললে—অনিমেষবাবুকে।

—কোথা থেকে আসছেন ? আপনার নাম ?

ভদ্রলোক যখন নিজের নাম বললেন, তখন সৌরেশদা তাড়াতাড়ি 'আসুন—বসুন' করে অতি সমাদরে তাকে এনে বৈঠকখানা-ঘরে বসালো।

দাদা কী কাজে বাইরে গিয়েছিল, তখনো ফিরে আসেনি। সৌরেশদা তাই বিনীত ভঙ্গীতে বললে—দয়া করে যদি একটু অপেক্ষা করেন, সৌরেশদা মার্কেটিং-এ গেছে, এখুনি ফিরবে।

শিল্পী বললেন—ঠিক আছে!

সৌরেশদা বললে—কিছু মনে করবেন না, আপনি ততক্ষণ বইটইগুলো একটু দেখুন, আমি ভিতরে চায়ের কথা বলে আসি।

উনি বলে উঠলেন—থাক না, অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

আমি ত ভিতরের ঘরে, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখতে পাচ্ছি! সৌরেশদা যখন পর্দা সরিয়ে ভিতরে এলো, তখন পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাকে বোধহয় বাইরে থেকে একটু দেখাও গিয়েছিল।

দেখি, দুটি উৎসুক চক্ষু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি সরে গেলাম।

সৌরেশদা ততক্ষণে কলরব করে উঠেছে! মহা আমুদে লোক, যতক্ষণ বাড়ি থাকবে, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে! আমাকে দেখেই বলে উঠল—কই, অপর্ণা কই, তোমার বর এসেছে যে?

সলজ্জ ঝংকারে বলেছিলাম—যাঃ-ও!

তার উত্তরে কী বলেছিল জানিস? বলেছিল—অপর্ণার তপস্যা সার্থক এতদিনে। মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হলো, দেখছ না কতো শীগ্‌গিরই এসে উপস্থিত হয়েছে!

বলে উঠেছিলাম—যাও, কী যে হাসাহাসি করো তোমরা।

আবার হো-হো করে হেসে উঠল সৌরেশদা। আমার ভয় হচ্ছিল, পাশের ঘর থেকে সব বোধ হয় শুনতে পাচ্ছে লোকটা! পরে জেনেছিলাম, প্রত্যেকটি কথা তার কাণে গিয়েছিল।

সৌরেশদা কিছুক্ষণ পরে আমাকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বললে—দিদি চা করছে। অপর্ণা, তোমার বরকে চা আর খাবার দিয়ে এসো।

—ঈস, বয়ে গেছে আমার! বর না হাতি!

—সেকী!—সৌরেশদা বলেছিল—সব ঠিকঠাক—আজ বাদে কাল বিয়ে দিলেই হয়, বর না কী রকম?

সত্যি কণা, কী রকমটা যেন ছিলাম তখন! সৌরেশদার কথায়

রাগ করে বলে ফেলেছিলাম—বাজে ব'কো না, বয়ে গেছে আমার ঐ চালিয়াৎটাকে বিয়ে করতে।

পরে শুনেছি, ঐ চালিয়াৎ শব্দটা নাকি ও শুনতে পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, শুনতে ওর ভালো লাগে নি।

সৌরেশদা কিন্তু তখনো আমাকে ক্ষ্যাপাচ্ছে—আচ্ছা অপর্ণা, একে নয়, তাকে নয়, তাহলে কাকে বিয়ে করবে শুনি?

বলে উঠেছিলাম—কাউকে না।

সৌরেশদা চোখ বড়ো করে কৃত্রিম বিস্ময়ে বলেছিল—সত্যি?

—একশোবার সত্যি। সেই কার্মাটাড় থাকতে বছরখানেক ধরে দাদাকে কী রকম ঘোরাচ্ছে ঐ লোকটা, তা জানো?

—বৃহৎ ব্যাপারে এসব একটু হয়েই থাকে, সেটা খুব দোষের নয়।

রাগ তখনো কমেনি। বলে উঠেছিলাম—হাজার বার দোষের! মানুষের মন নিয়ে খেলা, সোজা কথা নয়।

সৌরেশদা সবিস্ময়ে বলে উঠল—তাই নাকি! মনের খেলাও হয়ে গেছে, এতো জানতাম না!

রাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল, বলেছিলাম—দেখ সৌরেশদা, ফাজলামো কোরো না।

সৌরেশদা বললে—ওরে বাস্ খুব যে রাগ দেখছি! অতি রাগ অতি অনুরাগের লক্ষণ কিন্তু।

—বিরক্ত কোরো না, দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেবো, বলে দিচ্ছি।

তা সৌরেশদার সঙ্গে কি পারবার জো আছে? অমনি বলে বসল—তাহলে ত ষোলোকলা পূর্ণই হয়। তুমি অপর্ণা, আর উনিও বিশ্বনাথ, না হয় অপর্ণাকে নিয়ে আরেকবার বিশ্ব পরিক্রমা করবেন, তাতে আর কী, তবে এই ইতর জনদের জন্য মিষ্টান্নের কথাটা ভুলো না কিন্তু।

বলে উঠেছিলাম—আমাকে জড়িয়ে ও লোকটার কথা আর তুলো না সৌরেশদা, আমার হাড়শুদ্ধ জ্বালা করে ওঠে!

যাইহোক, এর মধ্যে বৌদি এসে ঘরে ঢুকল জলখাবারের ট্রে নিয়ে। এসে বললে—কী তর্কাতর্কি করছিস, যা, এটা দিয়ে আয়।

বললাম—না, আমি পারব না।

বৌদি বললেন—ওমা, সেকী!

তারপরে কতো অনুনয়, বিনয়, কিন্তু আমার সেই 'না' আর তখন কিছুতেই 'হ্যাঁ' হলো না।

অগত্যা পর্দা ঠেলে সৌরেশদাই গেল ট্রে হাতে নিয়ে। এঘর থেকে আমরা শুনছি, ভদ্রলোক বললেন—সর্বনাশ করেছেন! অতো কী?

সৌরেশদা বেশ ভদ্রতা-টদ্রতা করতে পারে। বললে—না না, এ তো কিছুই নয়। আর তাছাড়া, এ তো আমাদের কর্তব্য।

ভদ্রলোক খাওয়া শুরু করেছেন, সৌরেশদা কতো কী কথা বলছে, এর মধ্যে টের পেলাম, দাদা এলো বাইরে থেকে। শুনতে পেলাম দাদার কণ্ঠস্বর—এই যে! কিছু মনে করবেন না, কয়েকটা জিনিষ কিনতে গিয়েছিলাম, দেরী হয়ে গেল।

—না না, তার জন্য কী?

এই রকম সব সাধারণ কথাবার্তা চলছে। একসময় ভদ্রলোক বললেন—দেখুন, আমাকে একটু সকাল সকাল উঠতে হবে!

—ও হ্যাঁ—বলে উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে দাদা চেঁচিয়ে উঠলেন—কইরে, পান নিয়ে আয়।

সৌরেশদা ততক্ষণ ভিতরে এসেছে। বৌদি বললে—এইবারে তুই যা, পানটা দিয়ে আয়।

বলে উঠলাম—কখখনো না।

বৌদি বললে—তোর দাদা ডাকছে যে!

বললাম—ডাকুক।

বৌদি রাগ করে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরের দিকে গেল। সৌরেশদা

গলার স্বর একটু নামিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি তাহলে ঠিক কাকে বিয়ে করতে চাও, বলো ত অপর্ণা ?

বললাম—কাউকে না।

—ঐ বিশ্বনাথবাবুকেও না ?

রাগ আমার পড়েনি তখনো, বললাম,—ঈস, বয়ে গেছে আমার !

সৌরেশদা কি সহজে ছাড়বার পাত্র। বলে বসল—তবে, কাকে বিয়ে করবে ?

বললাম—বলব না।

ওমা! তারপরে সৌরেশদা ফস করে কী বলে বসল জানিস ? বলে বসল—আমাকে ? আমি ত হেসে বাঁচি না! সত্যিসত্যি হেসে উঠেছিলাম খিলখিল করে। বলেছিলাম—উঃ মাগো কী দুষ্টুই না হয়েছ তুমি সৌরেশদা !

এ ঘরে হাসাহাসি হলেও ও ঘরে কিন্তু একজনের মর্মমূলে তীর গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে। পরে সব শুনেছি। সৌরেশদার মুখের ঐ 'আমাকে' শুনেই ওর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল আর কী !

ইতিমধ্যে বৌদি আবার ফিরে এসেছে তার মাকে নিয়ে। তাঁর কথা কি আর ঠেলা যায় ? অগত্যা একটা রেকাবীতে কিছু সাজা পান নিয়ে পর্দা ঠেলে উপস্থিত হলাম গিয়ে ঘরে সৌরেশদার পিছনে পিছনে। মুহূর্তমাত্র, কী যে তাকাবার ভঙ্গী! ভদ্রলোক তাকাচ্ছিলেন, দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, আমি কি স্বর্গের অপ্সরী না কী ?

সে দৃষ্টি সইতে না পেরে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম এ ঘরে।

তারপরেই শুনলাম দাদা সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন।

ভদ্রলোক সংকল্প করে এসেছিলেন, এ প্রস্তাবের উত্তরে 'না' বলবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ালো কী ?

বলে উঠলেন—আমার অমত নেই, তবে মাকে একবার—

সৌরেশদার সর্দারী তখনো চলেছে, বললে—তার জন্য ভাববেন

না, চিঠি লেখালেখি ত চলেছেই, তারপরে অনিমেষদা নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এসেছে সেদিন।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন—আমার অমত নেই।

কণা বললে—ধন্যি মেয়ে বাবা। তারপর কী হলো?

অপর্ণার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, বললে—বিয়ে ভেঙে গেল।

—সে কী রে!

—হ্যাঁ।

—কেমন করে?

অপর্ণা বললে—আমি ত দাদার সঙ্গে কার্মাটাড়ে চলে এলাম। মাসখানেক কেটে গেছে, বিয়ের দিন দেখা হয়েছে, বিয়ের ব্যাপারটা প্রায় ঠিকঠাক, এমন সময়—

ও থেমে গেল। কণা বললে—এমন সময়, কী হলো?

অপর্ণা বললে—অফিস থেকে ফিরছিলেন, পথে বাস্ চাপা পড়ে অ্যাক্সিডেন্ট হলো আমার ভাবী শ্বশুরের। মারা গেলেন তিনি।

—ঈস্!

—হ্যাঁ ভাই—অপর্ণা বললে—একটি বছর কেটে গেল তারপর। শুনেছি, ওর মা খুব ভালো মানুষ, কিন্তু, আর সব আত্মীয়স্বজন বললে,—এ বিয়ে ভেঙে দাও, মেয়ে অপয়া।

বিয়ে ভেঙে গেল এমনি করেই।

কণা বললে—তারপর?

অপর্ণা বললে—হ্যাঁ ভাই, সংসারে আশ্চর্য জিনিষও ঘটে। বাবার প্রভিডেন্ট ফণ্ডের কিছু টাকা হাতে পেয়ে ভদ্রলোক মাকে নিয়ে চলে এলেন কার্মাটাড়ে, এখানে এসে বাড়ি কিনলেন। সেই থেকে এখানেই আছেন।

কণা বললে—কোন বাড়িটারে?

অপর্ণা বললে—কাছেই। সাদারঙের একতলা বাড়ি, সামনে

ছোট্ট একটা বাগান। জেঠামশাইয়ের দুর্গে থেকে তুমি কী-ই বা চেনো?

কণা বললে—তুই যাস?

মুখ নীচু করল অপর্ণা, মাথা হেলিয়ে নীরবে জবাব দিলে—হ্যাঁ।

কণা বলল—আবার ভাবসাব হলো?

অপর্ণা বললে—ভাবসাব আবার কী? আছি, এই আর কী।

—বিয়ের কথা ওঠে না?

—না।

—কেন?

অপর্ণা একটু হেসে বললে—ওটা বোধহয় উভয়পক্ষ আমাদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে।

—তোর মিনুদির খবর কী?

—কে জানে!

কণা অবাক হয়ে বললে—চিঠি দিস না?

—না।

কণা বললে—বিশ্বনাথবাবুও বলেন না একবারও তার নাম?

—না—অপর্ণা বললে—জানবে কী করে যে আমার সঙ্গে চেনাশোনা আছে?

—তুই বলিস নি?

—না।

—তোর মিনুদিও তোকে চিঠি দেয় না?

—না।

—কী করে আবার এখানে প্রথম দেখা পেলি বিশ্বনাথবাবুর?

অপর্ণা বললে—মাকে নিয়ে একদিন বেড়াতে এসেছিল যে? সেই থেকে উনি আসেন না বটে, কিন্তু মা আসেন মাঝে মাঝে। এসে, বৌদির সঙ্গেই গল্প করেন বেশী। একবার জ্বর হয়েছিল, বাবাই ত গিয়ে চিকিৎসা করলেন!

—তুইত যাস বললি, গিয়ে কী করিস?

অপর্ণা বললে—মার সঙ্গে গল্প করি।

—আর ওঁর সঙ্গে?

—খুব কম।

কণা বললে—খুব ছবি আঁকে বুঝি? তোর এঁকেছে?

—ছাই।

—তবে?

অপর্ণা বললে—তবে আবার কী? এখানে, কাছেই নাকি কীসের কারখানা হয়েছে নতুন, সেখানে চাকরী নিয়েছে। বাস্-এ করে নিত্য যায় আসে। খুব ভোরে ওঠে।

—দেখিস বুঝি?

অপর্ণা বললে—হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই ত যায়!

—তারপর?

অপর্ণা বললে—লুকিয়ে লুকিয়ে ডায়রী লেখে। ডায়রী লেখার অভ্যাস আছে। সে সব কী কবিত্ব!

—তুই পড়েছিস বুঝি?

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করে উত্তর দিলো অপর্ণা,—হ্যাঁ।

—তোকে দেয়?

—না।

—তবে?

অপর্ণা মুখ তুলল, বললে—চুরি করে নিয়ে আসি।

—বটে!

বলে, দুই বন্ধুতে হাসতে লাগলে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

তা হাসুক, কিন্তু ওদিকে যে তখন কী নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তা ওদের জানা নেই। কখন যে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে সরে গেল, কখন যে আকাশে ভোরের তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলতে

লাগল, কখন যে পাখী ডাকতে লাগলে গাছে গাছে, সে ওদের দুজনের খেয়ালই নেই।

ওদের খেয়াল হলো তখন, যখন দরজার কড়া ধরে কে যেন সজোরে নাড়া দিতে লাগল।

ওরা চুপ করল। শব্দ পেলো বাইরের ঘরের দরজা খোলার কারা যেন কথাবার্তা বলছে। দরজা খুলল দাদার ঘরের। দরজা খুলল বাবার ঘরেরও।

তারপরে একসময় নড়ে উঠল ওদের ঘরের দরজার কড়াও। শোনা গেল মায়ার কণ্ঠস্বর—অপর্ণা, দরজা খোল।

উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল অপর্ণা।

মায়া বললে—কণিকা কই? উঠেছে?

—ও তো জেগে।

মুখ বাড়িয়ে কণাকে ভালো করে দেখে নিলো মায়া, বললে—বাইরে এসো, তোমার জ্যোঠামশাই এসেছেন!

—জ্যোঠামশাই!

—হ্যাঁ।

কণিকার পক্ষে এ এক চমক ত বটেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবটা ওর মনে জেগে উঠল, সে হচ্ছে—আতঙ্ক! এবং সে আতঙ্ক নিজেকে নিয়ে ততটা নয় যতোটা অনুপমকে নিয়ে।

সে এগিয়ে এসে দুহাতে অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল—কী হবে ভাই?

অপর্ণা বললে—কী আবার হবে! আয় ত দেখি আমার সঙ্গে।

দুজনে পায়ে পায়ে ঘরের চৌখাট থেকে বাইরে এলো।

অপর্ণা বললে—আয়, আগে কলঘরে আয়, চোখেমুখে জল দিয়ে নে, যুদ্ধ ত করতেই হবে,—চোখে-মুখে জল পড়লেই মনের তন্দ্রা ঘুচে যাবে!

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় কণিকার, বলে—মনের তন্দ্রা আবার কী।

অপর্ণা বলে—ঘুম ভাঙলেও ঘুমটা অনেক সময় চোখে লেগে থাকে ত? তেমনি মনের ভয় ভাঙলেও খানিকটা ভয় মনকে জড়িয়ে থাকে; তাকেই বলে মনের তন্দ্রা, বুঝলি?

আর বাক্যব্যয় না করে কলঘরের দিকে গেল ওরা।

কিন্তু, বেরিয়ে আসবার পর, অপর্ণা তার বাবাকে ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে বাইরের ঘরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে, অবাক হয়ে গেলো।

মায়া দাঁড়িয়েছিল তার ঘরের দরজার সামনে, ওদের দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে—দেরী কোরো না কণা, উনি খুব খুঁজছেন তোমাকে। অনুপমবাবু কোথায়? কলঘরে?

উত্তর দিলে অপর্ণা, বললে—সে কী! বাইরের ঘরে নেই?

—না ত!

—কোথায় গেলেন তবে?

মায়া বললে—দরজা ত উনিই খুলে দিলেন কণার জ্যেঠামশাইকে। তারপরে কোথায় গেলেন?

কণা আর কোনো কথা না বলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। অপর্ণাও গেল পিছনে পিছনে।

বাইরের ঘরে বসে আছেন বিজনবাবু, অপর্ণার দাদা অনিমেষ আর অপর্ণার বাবা।

ওদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন বিজনবাবু। কণা জ্যোঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল! একটি রাত্রে মানুষের চেহারা এমন বদলে যায়! মাথার চুল এলোমেলো, চোখদুটো বসে গেছে! বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত চেহারা!

কণার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন বিজনবাবু,—বাড়ি চল, তোমার জ্যেঠাইমার খুব বাড়াবাড়ি! বোধহয় বাঁচবে না!

উত্তরে অপর্ণার বাবা যেন কী বলে উঠলেন, অপর্ণার দাদা অনিমেষবাবুও কিছু বললেন। সে সব কথা কণার কাণে গেল না, তার চোখের সামনে জ্যেঠাইমার বিবর্ণ মুখখানা ভেসে উঠল। ইচ্ছা হলো, এই মুহূর্তে ছুটে যায় সে! কিন্তু, পরক্ষণেই আশ্চর্য কঠিন হয়ে গেল তার মুখখানা। অদম্য সাহস নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে সোজা তাকালো জ্যেঠামশাইয়ের মুখের দিকে, বললে—সে কোথায়!

ঘরের সবাই বুঝি অবাক হয়ে গেল ওর কথায়।

কথা বলতে একটু দেরীই হলো জ্যেঠামশাইয়ের। তিনি বললেন—কে? অনুপম? সে আমার মুখে খবরটা শুনেই আর দাঁড়ালো না, ছুটে গেল আগে আগে। এবার তুই চল, যাবি না? তোকে সে খুব খুঁজছে! বলছে—কণা? কণা কই? তাকে লুকিয়ে রেখেছ! তাকে এনে দাও!

বলতে বলতে, ছেলেমানুষের মতো চোখের জল ফেলতে লাগলেন বিজনবাবু।

জগতে কতো আশ্চর্য কাণ্ডই না ঘটে! কণা তার জ্যেঠামশাই আর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখে, জ্যেঠাইমার শিয়রে বসে আছে—অনুপম, আর জ্যেঠাইমার পায়ের কাছে বসে বসে ঝি-টা কাঁদছে। বোধহয় কণার জন্যই প্রাণটা বেরোয়নি এতক্ষণ। কণাকে দেখে কথা বলতে পারছেন না, চোখের দৃষ্টিও ঘোলাটে, শুধু কণা যখন জ্যেঠাইমা বলে কেঁদে পড়ল, তখন মাথাটা যেন একটু নড়লো বলে মনে হলো, এবং তারপরেই সব শেষ।

মৃত্যুটা অসাধারণ কিছু নয়, মৃত্যু ত একদিন আসবেই। বরং দীর্ঘকাল এভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে সংসারে সবার ভারবাহী হয়ে কাটানোর থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

বিজনবাবু কণাকে ধরে তুললেন, বললেন—কাঁদিসনে মা,

গেছে, শান্তি পেয়েছে। এখন বাকী কাজটা ত আমাদেরই করতে হবে। অনুপম গেল কোথায়?

ঘরে অনুপম নেই। কখন আবার সে ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে কে জানে!

অপর্ণার বাবা ফিরে গিয়ে অপর্ণাকে আর অনিমেষকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আরও একটি লোক এসে উপস্থিত হয়েছে, তার সঙ্গে কণার চাক্ষুষ পরিচয় নেই, সে হচ্ছে—বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ ও অনিমেষের চেষ্টায় আরও কয়েকজনকে পাওয়া গেল। শেষকৃত্য করে ওরা যখন ফিরে এলো, তখন অপরাহ্ণ। ওরাও ফিরল, দেখা গেল অনুপমও আসছে।

ঠিক তখন আর কথা হলো না, কথা হলো সন্ধ্যার পরে। অপর্ণা বিশ্বনাথ অনিমেষবাবুরা চলে যাবারও বহুক্ষণ পরে।

একান্তে পেয়ে কণা প্রশ্ন করলে—গিয়েছিলে কোথায়?

অনুপম বললে—আমি ঠিক ওসব দেখতে পারি না। তাই শ্মশানের ব্যাপার-ট্যাপার পরিহার করলাম।

—খাওয়া দাওয়া করেছ?

—না। কী হয়, একবেলা না খেলে?

কণা বললে—ছিলে কোথায়, তা-ও বলবে না?

অনুপম মুখ তুলে বললে—পাশের বাড়ি। বুঝতে পারলে? শোভাদের বাড়ি। গিয়ে দেখি, জিনিষপত্র গোছ-গাছ হচ্ছে। ওঁদের সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলাম ওঁদের, সেই বেলা বারোটার গাড়ীতে। তারপরে, ফিরে এসে আনমনে ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে বড়ো রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূর, সেই যে নতুন কারখানাটা হয়েছে, সেই পর্যন্ত। এই ত ফিরে আসছি।

কণা বললে—শোভারা চলে গেল কেন?

—কে জানে!—অনুপম বললে—আমি কৃতজ্ঞ সুলতা দেবীর

কাছে। ষ্টেশনের প্লাটফর্মে পায়চারী করতে করতে এক দিকে ডেকে নিয়ে গেলেন আমাকে। বললেন—আমি কিন্তু তোমার ওপর রাগ করি নি। বরং, তুমি যে কাউকে মনে মনে ভালবাসো, একথা আগে জানলে আমরা এতদূর অগ্রসর হতাম না। বলতে বলতে সুলতা দেবী হঠাৎ কেঁদে ফেললেন, বললেন—ভালবাসার মূল্য আমি জানি। তুমি সুখী হও অনুপম। যা হলো, তার জন্য আমি দুঃখিত নই।

স্থির হয়ে সব শুনছিল কণা। তারপরে, মুখ তুলল ওর দিকে, বললে—বোসো তুমি। দাঁড়িয়ে থেকো না। কেন গিয়েছিলে মিছিমিছি অতদূর ঘুরতে?

এমন যায়গায় ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, যেখান থেকে পাশের বাংলোবাড়িটা দেখা যায়! কটা দিন ওখানে আলো জ্বলেছিল, কটা দিন ওখানে জেগে উঠেছিল জীবনের কলরব, আজ হঠাৎ সব নিথর, নীরব হয়ে গেছে! আলো নেই—কিছু নেই—মৌন সন্ন্যাসীর মতো অন্ধকার প্রান্তরে বসে বাড়িটা যেন কী এক কঠিন তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছে!

একটা প্রশ্ন শুধু জাগছিল অনুপমের মনে। সুলতা দেবী এমন ক্ষমাশীল হয়ে উঠলেন কেমন করে? কেনই বা তিনি অমন করে কেঁদে ফেললেন তার কাছে!

'—ভালবাসার মূল্য আমি বুঝি!'

ওঁর মুখের কথাটা এখনো কানে এসে বাজছে!

কণিকাই ওর অন্যমনস্কতা ভাঙালো। বললে—কী অতো ভাবছ? শোভার কথা?

চমকে উঠল অনুপম, বললে—না! সুলতা দেবীর কথা।

কণিকা কিন্তু সেদিকে আগ্রহ দেখালো না একটুও। সে একটুক্ষণ থেমে থাকবার পর হঠাৎ বলে উঠল—আচ্ছা, ঐ যে

কারখানাটা দেখে এলে, সেটা কেমন ?

—কেমন আবার! ছোট্ট কারখানা!

কণা বললে—ওখানেই কাজ করেন বিশ্বনাথবাবু।

—কে বিশ্বনাথবাবু!

—ঐ যে অপর্ণাকে দেখলে না ? বিশ্বনাথবাবু হচ্ছে অপর্ণার—!

অনুপম সংক্ষেপে বললে—বুঝেছি।

পরদিন। বিকেলের দিকে কণার জ্যেঠামশাই, অর্থাৎ বিজনবাবু আবার এলেন অপর্ণাদের বাড়ি, এসে বসলেন বৈঠকখানায়, অপর্ণাকে দেখে এক গেলাস জল চেয়ে খেলেন। অপর্ণা বললে—বাবা বাড়ি নেই, দাদাও নেই।

বিজনবাবু বললেন—তা না থাকুক, আমি তোমার কাছেই এসেছি মা। তুমিই ত ওদের বন্ধু ছিলে! ওরা চলে গেছে মা ?

—কারা ?

বিজনবাবু বললেন—একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে কণা। চিঠিটা আর আমি আনিনি সঙ্গে করে। কী হবে আর চিঠিতে ?

—চলে গেল ?

বিজনবাবু বললেন—হ্যাঁ। ওরা ভাবল, আমার সঙ্গে দেখা করে গেলে, আমি হয়ত ওদের যেতে বাধা দিতাম। মানুষ মানুষকে কতো ভুল বোঝে, দেখ মা! তোমাকে কিছু বলে গেছে ?

অপর্ণা অবাক হয়ে বললে—না ত! বিশ্বাস করুন, ওরা আমার সঙ্গে দেখা করেও যায় নি।

বিজনবাবু বললেন—তোমার সঙ্গেও দেখা করে যায় নি তাহলে!

অপর্ণা বললে—কোথায় ওরা গেল, জানেন ?

—কী করে জানব!—বিজনবাবু বললেন—চিঠিতে সেসব কিছু লেখেনি। তা যাক, আমার আর কী, ওর বাবাকে চিঠি দিয়ে খবরটা জানিয়ে দেবো। ব্যস, আমার কর্তব্য শেষ।

চুপ করে রইল অপর্ণা। মায়াও এক সময় ভিতর থেকে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছে বিজনবাবুর কথা।

উনি একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে লাগলেন—মেয়েটার হাতে কিছু টাকা আছে। সেই টাকায় এদেশ ওদেশ করবে আর কী কিছুদিন! ছেলেটা চাকরী-বাকরী করে কিছু, জানো?

—চাকরী ত করে, কিন্তু সে চাকরী কী আর সে করবে?

—কেন?

অপর্ণা একটুক্ষণ দ্বিধার পর অবশেষে ওঁকে বলেই ফেলল সব কথা। বিয়ে করার সর্তে চাকরী, কিন্তু সে বিয়েই যখন হলো না, তখন ওখানে চাকরী করার আর প্রশ্নই ওঠে না।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন জ্যেঠামশাই। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললেন—তাহলে বুঝতে পারছ মা, কতো অবিবেচনার কাজ করেছে ওরা! কেন, বিয়ে-থা করে আমার ওখানে থাকতে ওদের কী হয়েছিল! আমি কি বাধা দিতাম? সংসারে আমার আর কী আকর্ষণ রইল, বলো ত মা! ভাবছি, ওর বাপকে যে চিঠি লিখব, তাতে এ-ও লিখে দেবো, তপন-স্বপনকে শান্তিনিকেতন থেকে এখানে পাঠিয়ে দাও, আমার কাছে এসে থাকুক, এখানকার স্কুলে পড়াশুনা করুক, আমি তাদের সমস্ত ভার নেবো।

তারপরে, ওরা দুটি মেয়ে তার দিকে অমন বিস্মিত হয়ে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য করে, অল্প একটু হাসলেন বিজনবাবু, বললেন—অবাক হচ্ছো, না মা? আমার মতো মানুষ একী কথা বলছে আজ! আমার ঐ যে বাড়ি দেখছ, ওর চার পাশে আমার সখের বাগান ছিল, ফুলে-ফুলে ভরে থাকত সে বাগান, কিন্তু সব একদিন শেষ হয়ে গেল! তোমরা ত দুদিন এসেছ, এখানকার যারা পুরনো, তারা জানে, তারা দেখেছে, কেমন সৌখীন মানুষ ছিলাম আমি!

খানিকক্ষণ গল্প করার পরই উঠে গেলেন। উঠে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন একটা বিষাদের ছায়া। মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল অপর্ণার। বই নিয়ে বসল, পড়ায় মন বসল না, ছাদে গিয়ে ঘোরাঘুরি করল, তা-ও ভালো লাগল না! একবার মনে হলো, চুরি যাওয়া দিনপঞ্জীর খোঁজে আসতেও ত পারত একজন! তা আসবে না, যখন মন চায় তখনই সে আসবে! এমনি উদাসীন। বিশ্বনাথ, ত সত্যিই বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ কেন, অপর্ণা মনে মনে বলল, নাম রাখা উচিত ছিল—ভোলা মহেশ্বর!···কিন্তু, আরও একটা চিন্তা মনের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করছে, কণা যাবার সময় একবার দেখাও করে গেল না!

পরক্ষণেই মনে হলো, হয়ত না দেখা করে যাওয়ার বিশেষ কোনো কারণও ঘটেছিল। যেখানেই যাক, নিশ্চয়ই দু তিন দিনের মধ্যে তাকে চিঠি লিখবে কণা। কিন্তু গেল কোথায়?

এ সব ভাবতে ভাবতে ছাদ থেকে আবার ঘরে ফিরে এলো অপর্ণা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঘরে ঘরে আলো জ্বলে গেছে। টুকটাক দু'একটা নিত্যকরণীয় গৃহকাজ শেষ করার পর যখন একটু অবসর পেলো, তখন ঘরের এককোণে বসে সেই একজনের কাছ থেকে চুরি করে আনা দিনপঞ্জীটা চুপি চুপি পড়তে শুরু করল অপর্ণা।

পরদিন। সকাল বেলা। এ-ও একটা বাড়ির ছাদ, তবে অপর্ণাদের বাড়ির ছাদ নয়। শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ছাদে বসে বসে বড়ি দিচ্ছেন বিশ্বনাথের মা। সাদা থানের ওপর জড়ানো মোটা চাদরটা এলিয়ে পড়েছে, বিশ্বনাথ নীচে থেকে 'মা-মা' করে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ এক সময় ছাদে উঠে এলো।

মা মুখ ফিরিয়ে বললেন—কী রে?

—আমার খাতাটা দেখেছ? দুদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না।

—সে কীরে! কোথায় গেল তোর খাতা!

—কোথায় গেল, সেটাই ত আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি।

বিশ্বনাথ যেন এবার একজনকে হঠাৎ দেখতে পেলো। একজন যে ভোরবেলাতেই এ বাড়িতে এসেছে, তারই ঘরের পাশ দিয়ে মার সঙ্গে উঠে এসেছে ছাদে, এসব সে চুপিচুপি লক্ষ্য করলেও, যেন কিছুই জানে না, এমনই ভাব করল সে।

মায়ের আড়ালে গোলাপী পশমী চাদরে ঢাকা সেই একজন যতদূর নত হওয়া যায়, ততখানি নত হয়ে মুসুর ডালের বড়ি দিচ্ছিল ছোট ছোট করে। দেখতে দেখতে বিশ্বনাথের মনে হলো, ওর চাদরের রঙের সঙ্গে বড়িগুলির রঙেরও আশ্বর্য মিল ত!

বুঝতে কি বাকী আছে বিশ্বনাথের, দিনপঞ্জীর ব্যাপারে চৌরকার্য কার হতে পারে?

গভীর মনোযোগে বড়ির বিন্দুগুলি সারি সারি সাজিয়ে যেন এক অতি দুর্বোধ্য ছবি আঁকতেই সে ব্যস্ত।

বিশ্বনাথ কপট গাম্ভীর্যে বলে উঠল—মা, ওকে জিজ্ঞাসা করো ত?

মা কিছু বলবার আগেই সেই একজনের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—বা রে!

বিশ্বনাথ আবার বললে,—মা, জিজ্ঞাসা করো দেখি, ও নিয়েছে কি না!

অমনি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো অপর্ণা,—দেখুন দেখি মাসীমা, আমি নেবো কেন? আমি ত সেই ভোর থেকেই আপনার কাছে ছাদে,—আমি ওসব খাতার কী জানি?

হাসি লুকিয়ে পর মুহূর্তেই নীচে চলে এলো বিশ্বনাথ। সে জানে, ও-ই নিয়েছে। কিন্তু ডাকাত ত কম নয়! ঘুমন্ত ব্যক্তির শিয়র থেকে খাতা নিয়ে উধাও হওয়া! মেয়ের 'সাহস' আছে বলতে হবে!

কিন্তু যা মনে মনে আশা করেছিল বিশ্বনাথ তা হলো না। ভেবে ছিল মার হাত জোড়া, মা হয়ত অপর্ণাকে বলবেন নীচে এসে ওকে জলখাবার পরিবেশন করতে।

কিন্তু তা হলো না, অপর্ণার বদলে খাবার নিয়ে মা নিজেই এলেন, বললেন,—ছিঃ বিশু, অমন করে কথা বলতে হয়! আমি নাহয় মা, কিন্তু পরের মেয়ে তোমার অতো ঝক্কি পোয়াবে কেন? অপর্ণা বোধ হয় রাগ করেই খিড়কী খুলে চলে গেল।

বিশ্বনাথ সম্ভবতঃ বলতে গিয়েছিল—পরের মেয়েরাই ত পরের ছেলের ঝক্কি পোয়ায় মা!

কিন্তু বললে না সে মুখ ফুটে মনের কথা। আজও ঠিক সময় হয় নি, যখন একবার বিবাহে বিঘ্ন ঘটেছে, তখন মনে মনে ভেবে দেখেছে বিশ্বনাথ, আরও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন, তারপরেই মায়ের একান্ত অভিলাষের কাছে আত্মনিবেদন করা যেতে পারে।

কিন্তু, এটাই বা কী রকম কথা? ভাবতে লাগল বিশ্বনাথ—খাতাটা নিয়েছে কি না, এটা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই অপরাধ হয়ে গেল? আসুক আজ দুপুরে,—প্রশ্ন করতেই হবে।

কিন্তু সারা দুপুর ছট্‌ফট্‌ করে করে কেটে গেল বিশ্বনাথের, এলো না অপর্ণা। এটা ওটা পড়বার জন্য তাক থেকে বই নামিয়ে খাটের ওপর স্তূপাকার করল বিশ্বনাথ—বইয়ের বল্মীক-স্তূপের মধ্যে যেন শীর্ণকায় বাল্মীকি!

বন্ধুরা বিকেলে এসে এই উপমা দিয়েই ঠাট্টা করল তাকে, তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেল ব্যাডমিণ্টন-ক্লাবে। কিন্তু মন কী বসে? সন্ধ্যা হতে না হতেই কী একটা ছুতো করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো বিশ্বনাথ।

দরজা খোলাই ছিল, নিজের ঘর পেরিয়ে মার ঘরের দিকে যেতে গিয়েই ওর কাণে এলো অপর্ণার কণ্ঠস্বর। মার কাছে কী সব গল্প করছে, হাসির টুকরো মেশানো তুচ্ছ সব ঘটনার বিস্তার!

আলোটা জ্বালিয়ে খাটের দিকে তাকাতেই চমকে গেল বিশ্বনাথ। মা বিছানা বিকেলেই পেতে রাখেন, সেই পাতা বিছানায়, শিয়রের বালিশের কাছে পড়ে আছে ওর সেই হারাণো দিনপঞ্জীর খাতাখানা!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো খাতাখানা। পৃষ্ঠাগুলো ওলটাতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় ওর চোখে পড়ে গেল, ভাঁজ-করা একটা কাগজ!

খুলে ফেলতেই বুঝল সে ব্যাপারটা। ভালোলাগা ত বটেই, একটা খেলার নেশারও যেন আস্বাদ পেল সে। ভাঁজ করা কাগজটায় আঁকা-বাঁকা মেয়েলী ছাঁদে লেখা ছিল ছোট্ট দুটি লাইন, তা-ও সম্বোধনহীন, স্বাক্ষর-হীন। কে কাকে লিখছে, তৃতীয়পক্ষের বোঝবার উপায় নেই। লেখা ছিল,—খাতাখানা আগেই আমার চুরি করে পড়া উচিত ছিল। এ যে একেবারে কাব্য। বিয়ে ভেঙে গেল, অভিভাবকরাও সেই থেকে নিশ্চুপ, এ নিয়ে দুঃখ করেও শেষকালে কী লেখা হয়েছে? 'অভাবের সংসার, এখানে ওকে স্বাগত করি কেমন করে?' সত্যি বলছি, কথাটা পড়ে দুঃখ পেয়েছি। এই তোমার মনের ভাব? আচ্ছা একটা কথা বলব? মিনুদিকে কি একবারও মনে পড়ে না? আমি বলি, আবার ছবি আঁকা শুরু করো না? আর, বিয়ে? আমিই সবাইকে চুপ করিয়ে রেখেছি, নইলে এতদিনে সানাই বেজে উঠত। কেন চুপ করিয়ে রেখেছি সে কথা পরে বলব।

চিঠিটা, চিঠিই ওটাকে বলা যাক, রেখে দিল বিশ্বনাথ যত্ন করে ওর হাত বাক্সে। রেখে, একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করল বিশ্বনাথ অনুরূপ ভাবে। অপর্ণা চলে যাবার আগেই ওর হাতে সে দিয়ে দেবে চিঠির উত্তর। ওর এ চিঠিতেও কোনো সম্বোধন-স্বাক্ষর রইল না, বিশ্বনাথ লিখল, মিনু আমাকে চেনে, কিন্তু আমাকে কি আরেকজন তেমনিভাবে চেনে? ছবি আঁকার

কথা জেনেছ দেখছি, ওটা আমার খেয়াল, জীবিকা নয়। পিতৃদত্ত যা ছিল ক্ষয়ে গেছে, সাধ করে কী আর চাকরী নিয়েছি!

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' খানা লাইব্রেরী থেকে আনা ছিল, চিঠিটা তার মধ্যে লুকিয়ে বইটা হাতে নিয়ে মাকে ডাকতে ডাকতে মার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল বিশ্বনাথ। বললে—এই যে।

ওকে দেখে অপর্ণার মুখখানা যেন লজ্জায় আরও নত হয়ে গেল। মা ওকে বললেন—কখন এলি?

—এই মাত্র!

ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিশ্বনাথ বললে,—মার কাছে সকালে শুনলাম, তুমি নাকি রাগ করেছ?

মুখ নীচু করেই অপর্ণা বললে,—চোর বললে রাগ হয় না?

—ক্ষমা চাইছি। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বই দিতে চাই। নেবে?

মা বলে উঠল,—বই নেবে বলেই ত বসে আছে এতক্ষণ। সেই কখন এসেছে বিকেলে

হেসে বলল বিশ্বনাথ—এদিকে সন্ধ্যা ত পেরিয়ে গেল! পৌঁছে দিতে হবে বুঝি?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল মেয়েটি,—মাসিমা, আপনি চলুন না? অনেকদিন যান না আমাদের বাড়ি।

—তা বটে,—মা বলল,—রান্নাও হয়ে গেছে। হ্যাঁরে যাবো?

বিশ্বনাথ বলল,—তা যাও না।

—তাহলে চল মা পর্ণা, ঘুরেই আসি। তোর বৌদি কী রান্না করছে দেখে আসি।

উঠে দাঁড়ালো ছুজনে। বিশ্বনাথ বলল,—দত্তা পড়বে নাকি?

নিতান্ত উদাসীনের মতই সে বললে,—দত্তা আমার পড়া।

—পড়া?

অপর্ণা একটু থেমে তারপর বলল,—আচ্ছা দিন, বৌদিকে দেব পড়তে। ও পড়ে নি।

অপর্ণার এ-ক্ষেত্রে চাতুর্য আছে, কারুর সামনে ও বিশ্বনাথকে 'তুমি' করে বলে না, এ অভিনয়ে বোধ হয় মেয়েরাই পটু।

'দত্তা' চলে গেল। উত্তর কালই আসবে। এইভাবে চিঠির বিনিময়, অপূর্ব এক খেলায় মেতে গেল বিশ্বনাথ।

উত্তর এলো যথারীতি,—বুঝলাম। চিনি নি কি একজনকে এখনো? শুধু মিনুদিই চিনেছে? আমিও তোমাকে চিনেছি, তবে অনেক চোখের জলের মধ্য দিয়ে, সে খবর তুমিও জানো না। জানো কী? কণিকা যেমন করে অনুপমকে ছিনিয়ে নিয়েছে সংসারের সবার কাছ থেকে, আমিও তোমাকে নিয়েছি, আর কারুর সাধ্য নেই আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নেয়! তবে, চুপে চুপে একটা কথা বলে রাখি, বাবাই বলো আর দাদা-বৌদিই বলো, সবাইকে প্রকারান্তরে চুপ করিয়ে রেখেছি। আসল কথাটা শুনবে? আই-এ পরীক্ষাটা প্রাইভেটে দেবার চেষ্টা করছি, সেটা নিশ্চয়ই জানো? এটা উত্তীর্ণ হবার সংবাদ পাবার আগে পর্যন্ত এরা উচ্চবাচ্য করবে না, তুমিও কোরোনা।

এর উত্তর দিলো বিশ্বনাথ—পরীক্ষা আমারও সামনে। অর্থনৈতিক পরীক্ষা। সেটা পার হবার আগে পর্যন্ত তুমিও উচ্চবাচ্য করো না।

অপর্ণা লিখল,—বারে, এযে উল্টো চাপ! কে কাকে উচ্চবাচ্য করতে বারণ করে! কিন্তু সে যাক, খাতাটা আবার চুরি করবার সময় কী এসেছে?

উত্তর দিলো বিশ্বনাথ—অপেক্ষা করো। জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। পাড়ার ছেলেরা গিয়ে বিজনবাবুর কাছে জুটেছে। মানুষটির আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। পাড়ার ছেলেদের হরদম খাওয়াচ্ছেন! ছেলেরা বলেছে—থিয়েটার করব! উনি বলেছেন—ওঁর ফাঁকা জমির ওপর মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার করতে, খরচ-টরচ সব ওঁর। দেখছ ব্যাপারটা!

আমার ডাক পড়েছে পট আঁকবার জন্য। মেতে গেছি। ছেলেরা যেমন জড়িয়েছে, হয়ত দেখবে শুধু পট আঁকা নয় মুখেও রঙ মেখে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছি!

সে এক আশ্চর্য জীবন শুরু হলো বিজনবাবুর। যিনি অতিরিক্ত মিতব্যয়ী, অসামাজিক এবং কঠোর প্রকৃতির মানুষ বলে খ্যাত ছিলেন, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন সামাজিক, মধুর প্রকৃতির ব্যক্তি।

বিশ্বনাথের সঙ্গেও বিজনবাবুর বেশ একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। বিজনবাবু বললেন একদিন—ছোটভাইকে চিঠিতে সব লিখেছিলাম, উত্তর এসেছে। কী লিখেছে জানো? লিখেছে—আপনি কিছু ভাববেন না। অনুপম চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছে। ওরা এসে রয়েছে আমার কাছে। আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন।

আপন মনেই একটু হাসলেন বিজনবাবু, বললেন—আশীর্বাদ করব না কেন, কিন্তু অমন করে চলে গেল, তাই যা দুঃখ। তা ঠিক আছে। জানো বিশ্বনাথ, আজ তোমাকে বলি, লোকে জানে আমি নিঃসন্তান, কিন্তু ঠিক নিঃসন্তান নই, আমাদের একটি ছেলে হয়েছিল। আদর করে ওর মা ওকে ডাকত—মানিক। সেই মানিক মারা গিয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে—টাইফয়েড হয়ে। তখনো ডাক্তারবাবু কার্মাটাড়ে আসেন নি, সে অনেক দিনের কথা। তখন, আমার এখানে নার্সারী ছিল, নাম ছিল "বিজন নার্সারী।" ফুল ফোটাতাম অজস্র, ফুল ফোটানো আমার জীবিকাই ছিল বলতে পারো। মানিকের মা বিছানা নিলো, আমারও বাগান অবহেলায় শুকিয়ে যেতে লাগল।…নিশ্চুপে ওর কথাগুলি শুনে গেল বিশ্বনাথ। স্ত্রীর মৃত্যু যে ওঁর মনে কতখানি বেজেছে, এটা কি উপলব্ধি করতে বাকী আছে তার?

ক্রমে ক্রমে এমন হলো, বিজনবাবুর বাড়িতে ওদের জলসা আর গান বাজনা লেগেই রইল। অপর্ণার দাদা অনিমেষবাবু পর্যন্ত

নিয়মিত আসতে লাগলেন ওদের জলসায়, সাহিত্য আসরে, অভিনয়ের মহড়ায়। এবং অনিমেষবাবুর উৎসাহে একবার অপর্ণা জলসায় নাচ পর্যন্ত দেখালো। সে যে এত ভালো নাচতে পারে, এটা একেবারেই জানত না বিশ্বনাথ। ওর নৃত্যের সাবলীল ভঙ্গী ও তন্ময়তা, এ হলো বিশ্বনাথের কাছে এক আবিষ্কার।

বিজনবাবু ক্রমশই উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগলেন ছেলেদের ব্যাপারে, কয়েকবার ওদের ক্লাবেও এলেন নাটকের মহড়ায়। শেষ বয়সে শুধু ওঁর একটা নেশা লাগল,—সেটা হচ্ছে প্রবন্ধ রচনা ও সুযোগ পেলেই সবাইকে পড়ে শোনানো। প্রবন্ধগুলি আকারে খুব ছোট হলেও, বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়লে বোঝা যেতো,—বিষয়বস্তু সব কটারই প্রায় এক। সময় চলে যাচ্ছে, জীবনের সায়াহ্ন সমাগত, কতো কাজ বাকী রইল, কতো আশা সফল হলো না, কতো সঙ্কল্প সিদ্ধ হলো না,—কিন্তু এ সবের জন্য সময় বসে নেই,—ঘড়ীর কাঁটা ঠিক সরে সরে যাচ্ছে, পেণ্ডুলাম ঠিক দুলে দুলে চলেছে,—

দেখতে দেখতে এমন হলো, ছেলেরা বিজনবাবু বলতে অজ্ঞান; আর প্রতিবেশী প্রাচীনেরা অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন,—কীসের প্রতিক্রিয়ায় কী হয় দেখ!

ওঁর বাড়ির যেখানটায় ময়ূরের খাঁচা ছিল, সেইখানটা ভেঙে চুরে নাটক অভিনয়ের জন্য মঞ্চ তৈরী হতে লাগল। অভিনয়ের দিন যতো এগিয়ে আসতে লাগলো, ছেলেদের উৎসাহ, আনাগোনা আর কর্মচাঞ্চল্য ততই বেড়ে চলল।

অবশেষে অভিনয়ের ঠিক আগের দিন দেখা গেল, বিশ্বনাথ সব কাজ ভুলে ঐ মঞ্চে গিয়ে পর্দা টানিয়ে সিন আঁকছে। বন্ধুরা মঞ্চের কাজ করে মধ্যাহ্নে যে-যার বাড়ি চলে গেছে খেতে, বিশ্বনাথ যাই-যাই করে তখনো যায় নি। কাপড়ের ওপরে প্রথম প্রলেপ গ্ল-মেশানো হোয়াইটিংটা শুকিয়ে নিয়ে তার

ওপরে রং চড়িয়ে বসন্তকালের পুষ্পিত বনশ্রীকে আঁকবার চেষ্টা করছে তখন বিশ্বনাথ, পিছন ফিরে দেখে,—অপর্ণা। হঠাৎ ওকে দেখে ভয়ানক চমকে গেল বিশ্বনাথ, হাতের তুলিটাও গেল কেঁপে। বললে,—তুমি!

উত্তর এলো,—হ্যাঁ, আমি। গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ি। মাসীমা বললেন, খাওয়া নেই দাওয়া নেই নার্সারীতে গিয়ে ছবি আঁকছে, একবার ডেকে দিতে পারো? তাই ডাকতে এলাম।

বিশ্বনাথ লজ্জিত কণ্ঠে বলে উঠল, সর্বনাশ, কেউ দেখে নি ত?

অপর্ণা মুখ টিপে একটু হেসে বললে—জ্যেঠামশাই দেখেছে।

কণার বন্ধু ত অপর্ণা, সেই সম্পর্কে ধরে বিজনবাবুকে জ্যেঠামশাই বলে ডাকে অপর্ণা।

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল,—কিছু বললেন না জ্যেঠামশাই?

অপর্ণা বললে—কী আবার বলবেন? বললাম, জ্যেঠামশাই স্টেজ দেখতে যাচ্ছি, আসবার সময় কিছু ফুল তুলে আনব। উনি বললেন,—বেশ, যাও।—এলাম। এবার উঠে বাড়ি গেলে ভাল হয়, মাসীমা ভাতের থালা নিয়ে বসে আছেন।

তুলিগুলো তাড়াতাড়ি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে শুরু করল বিশ্বনাথ। তারপরে বললে—চলো।

দুজনে চলতে লাগল পাশাপাশি।

একটু পরে, অপর্ণাই নীরবতা ভঙ্গ করল প্রথমে। বললে—আচ্ছা, তোমরা থিয়েটার করছ, করো। কিন্তু আমার দাদাকে ক্ষেপিয়ে আবার আমার নাচ দেখবার ষড়যন্ত্র কেন নাটকের আগে?

—ভালো নাচতে পারো বলে!

—ঈস্! ভালো না ছাই!—বলেই হেসে ফেলল অপর্ণা,—তোমার চোখে রঙীন চশমা, তাই আমার নাচ-টাচ সবই তোমার ভালো লাগে!

বিশ্বনাথ বললে—অক্ষয় হয়ে থাক আমার রঙীন চশমা।

কথা বলতে বলতে ততক্ষণে ওরা বিজনবাবুর বাড়ির সামনেকার পথটা পেরিয়ে এসেছে।

অপর্ণা বললে—ভালো কথা জানো? কণা চিঠি লিখেছে।

—তাই নাকি! কী লিখেছে?

অপর্ণা বললে—লিখেছে, শীগগিরই ওরা কলকাতা যাচ্ছে ওর বাবার সঙ্গে। কলকাতাতেই বিয়েটা হবে।

—তাহলে ত সুখবর!—বিশ্বনাথ বললে—এবার আমাদের সুখবরটা ঘটবে কবে?

অপর্ণার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। সে বললে—আমি কী জানি! নিজেকেই জিজ্ঞাসা করো না?

বিশ্বনাথ বললে—নিজেকে ত জিজ্ঞেস করেই চলেছি ক্রমাগত। কবে আসবে আমাদের সেই সমারোহের দিন?

অপর্ণা মুখ টিপে হাসল আবার—এতদিন অপেক্ষা যখন করলেই, তখন আরও একটু অপেক্ষা করো। পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

বিশ্বনাথ বললে—তোমার পরীক্ষায় তুমি পাশ করবেই। আমি ভাবছি, আমার পরীক্ষার কী হবে।

—তুমিও পাশ করবে।

—বলছ?

—হ্যাঁ।

আর কোনো কথা হলো না। ওরা এসে গেছে বাড়ির সামনে।

অভিনয়ের আয়োজনের ব্যাপারে বিজনবাবু সেদিন একেবারে মেতে উঠলেন। বিশ্বনাথকে বারবার কাছে ডেকে বললেন,—বইটা বড়ো ভালো বই ধরেছ তোমরা।

তারপরে, বারে বারে ওর মুখের দিকে চেয়েছেন। মনে হচ্ছিল, কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না তিনি!

সন্ধ্যার সময় একবার বললেন,—বিশ্বনাথ, কতো চেয়ার পেতেছো তোমরা, আসবে কত লোক! আমার শূন্য শ্মশানপুরী আবার জেগে উঠবে, কী বলো!

শহর ও আশপাশের গ্রাম থেকে বহু লোকজন এসে পড়লেন একে একে। তাঁরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বিজনবাবু মহা উৎসাহে তাঁদের দেখাচ্ছেন তার বাগানের বিভিন্ন অংশ, চেনাচ্ছেন বিভিন্ন ধরণের ফুল! ওঁর কাছে আজ ফুল শুধু ফুলই নয়, যেন নবীন কবির প্রথম কবিতার অক্ষর পংক্তি!

সে রাত্রে বিজনবাবুর যে কী হয়েছিল, বিশ্বনাথ তা বুঝতে পেরেছিল। কারণ, একমাত্র বিশ্বনাথকে ডেকেই বিশ্বাস করে বলেছিলেন সব কথা। গভীর রাত্রে অভিনয় শেষে সবাই চলে গেছে, বিশ্বনাথও এবার চলে যাবে, এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল, পরিত্যক্ত নির্জন মঞ্চটির ওপরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কেমন যেন এলিয়ে পড়ে আছেন বিজনবাবু। দু একবার ডাক দিয়ে সাড়া না পেয়ে ভয় হলো বিশ্বনাথের। সে অমনি দৌড়ে গেল বাংলোর দিকে, বাংলোতে হারু আর বিপিনের সাহায্যে হ্যাজাক বাতিগুলো ঠিক করে রাখছিলেন এক ভদ্রলোক, তাঁকে সব বলল বিশ্বনাথ। তারপরে দু'জনে মিলে ছুটে এলো বিজনবাবুর কাছে। অনেক ডাকাডাকির পর ওঁর সাড়া পাওয়া গেল। মনে হলো, যেন ভীষণ ভয় পেয়েছেন বিজনবাবু!

রাত তখন প্রায় তিনটের কাছাকাছি,—সঙ্গী ভদ্রলোকটির বাড়ি দূরে, উনি সেই রাত্রেই হারুকে নিয়ে চলে গেলেন, আর বিশ্বনাথ বিজনবাবুর কাছেই রয়ে গেল।

বিজনবাবু বিপিনকে পাঠালেন ওর মাকে খবর দিতে। যদিও বিশ্বনাথ জানত, এ ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অপর্ণা, যে আজ উৎসবের প্রারম্ভে ফুলপরীর সাজে সেজে অপরূপ

তনু-হিল্লোলে দৃশ্য-সঙ্গীত পরিবেশন করে গেল মঞ্চমায়ার আলোয়, সে-ই আজ মার কাছে থাকবে—কারণ, বিশ্বনাথের বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হবে আজ।

সে এক বিহ্বল রাত বিজনবাবুর পক্ষে! ওঁর ঘরে বসে উনি বিশ্বনাথকে সব বললেন। বিশ্বনাথকে আর অপর্ণাকে এক সঙ্গে দেখে, ওঁর হঠাৎ কী যে হলো, উনি—

কিন্তু, সে ঘটনা ওঁর নিজের ভাষাতেই বলা যাক।

বলতে লাগলেন বিজনবাবু—"কী হলো, জানো? অভিনয় দেখে যাচ্ছি, দেখতে দেখতে মনটা কেমন উদাস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শেষ দৃশ্যে বৃদ্ধবেশধারী অভিনেতাটি যখন এক নিদারুণ হাহাকারে ভেঙে পড়লেন, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না! আমারও যে ওর মতো সব ছিল, আমিও যে ওর মতো সব হারিয়েছি!

কিন্তু যাক সে কথা। আসর ভাঙবার পর,—তোমরা আলো-গুলো নিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেলে, ব্যস্ত হয়ে পড়লে কাজ-কর্মে, আমি বাগানে তেমনি পড়ে রইলাম! গভীর রাত্রি, বাঁকা চাঁদ উঠেছে। অতি কোমল কোনো আঙুলের একেবারে ছোঁয়ার মতো লাগছিল সেই আবছা আলোছায়ার স্পর্শ! ঘুমন্ত বাগানটিও যেন এক করুণ স্বপ্নে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারবার! ঐ খানিকটা দূরে ঝাউয়ের সারি, এ পাশে টিকোমার অবারিত দাক্ষিণ্য, ওপাশে গোলাপ, আরও কিছু দূরে কিছু গাঁদা, কিছু সুইট্‌-পী, হলিহক আর চন্দ্রমল্লিকা!

নিজের দিকে তাকালাম। ঘাড়টা মাণিকের মা চলে যাবার পর থেকেই নুয়ে পড়েছে, তারপরে জোরে চলতেও পারি না, কষ্ট হয়। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে গেছে। সমগ্র শরীরে মনে মহা-কালের পদচিহ্ন।

বুঝলে বিশ্বনাথ, এই বাগানের রূপ এক সময় ভিন্ন ছিল।

সে আমার প্রথম প্রেম,—মাটিকে ভালবেসেছিলাম ঃ ওকালতিতে পসার হলো না, স্ত্রীর অসুখ হওয়ায় ওকে নিয়ে চলে আসতে হলো বাইরে। তাই, এখানে এসে কী আর করবো ? ঐ মাটি আর ফুল নিয়ে পড়লাম। দেশ বিদেশ থেকে আনালাম বীজ, আমার এই কয়েক বিঘা মাটির পৃথিবী তখন হেসে উঠল! এধারে ফুল, ওধারে ফুল,—ফুলে আর ফুলে হাসির সমুদ্র ঢেউ খেলে যেতো!

কিন্তু থাক, সে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় আর হাত দিয়ে লাভ নেই। আমি বাগান থেকে এলাম তোমাদের এই একরাত্রির রঙ্গমঞ্চে! দেখি, তখনো ঝুলে আছে যবনিকা। তার অন্তরালে,—অনেককিছু। কোথাও বিরাট রাজপ্রাসাদ, কোথাও যুদ্ধ শিবির, কোথাও মাঠ, কোথাও নির্জন বনভূমি, কোথাও বা অগ্নিদগ্ধ গ্রাম্য-কুটীর। এগিয়ে গেলাম। সেই নিস্তব্ধ প্রাসাদ, বিপুল অরণ্যানী তার মাঝে একটিমাত্র অভিনেতা আমি,—নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

এরপরের কথা বিশ্বনাথ, ঠিক বোঝাতে পারব না। কী রকম যেন হয়ে গেল! মনে হলো, অনেক পায়ের শব্দ শুনছি, অনেক কথা অনেক কাকলী! মরুভূমি যেন শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছে—

—যাই বলুন, আপনার বাগানটা কিন্তু সত্যিই চমৎকার!

একটু ম্লান আর মৃদু হেসে বললাম,—ভালো লাগল আপনার ?

মিসেস্ মুখার্জী বলে যে মহিলাটি চেঞ্জে এসেছেন সম্প্রতি, তিনি অপরূপ ভঙ্গিমায় একটু হেলে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন,—নিশ্চয়!

ঠিক সেই সময় কে যেন দ্রুত এগিয়ে এলেন আমার কাছে। বললেন—এই যে বিজনবাবু, আপনাকে মশাই খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। গেছলেন কোথায় ? আপনি হলেন গৃহস্বামী, আপনি কিনা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ? আসুন আসুন, আলাপ করিয়ে দেই।

আমার বন্ধু কলকাতা হাইকোর্টের নাম করা ব্যারিষ্টার মুখার্জীসাহেব আমাকে নিয়ে চললেন দর্শকমণ্ডলীর পুরোভাগে। কতো লোকের সঙ্গে যে আলাপ হলো এক-এক করে!

অভিনয় আরম্ভ হতে তখনো দেরী আছে, আমি অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পালা শেষ করে কী কাজ মনে পড়ায় বাড়ির দিকে চলেছি ব্যস্ত হয়ে, আর ডাকছি, ওরে ও হারু ও বিপিন?

কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। আমারই কণ্ঠস্বর অদূরবর্তী জনতার জটলা ভেদ করে উচ্চে উঠতে পারল না বোধ হয়।

অন্ধকারে খানিকটা এগিয়েছি, হঠাৎ দুই চোখ ঝলসে দিয়ে দুটো তীব্র আলো দেখা গেল। সইতে পারলাম না, খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়ে রেখে তারপরে প্রশ্ন করলাম,—কে?

—জ্যেঠামশাই, আমি।

—কে কেষ্ট?

—হ্যাঁ।

কেষ্ট ত তোমাদেরই ক্লাবের লোক, তোমাদেরই বন্ধু, থিয়েটার নিয়ে ও খুবই খেটেছিল। বললে,—আরও দুটো হ্যাজাক নিয়ে এলাম জ্যেঠামশাই। কোথাও মেলে নি, অতি কষ্টে রামু লালার কাছ থেকে যোগাড় করে আনলাম।

বললাম,—বেশ ভাই বেশ! তোমরা না হলে কিছুতেই হতো না এ সব। তা এখন ত নাচগান হবে, আসল নাটক আরম্ভ হতে দেরী কতো?

—তা ঘণ্টাখানেক!

কেষ্ট চলে গেল। আবার অন্ধকার।

ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছটার নীচ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ পায়ে কী একটা নরম ঠেকতেই থমকে দাঁড়ালাম।

—আঃ! কে?

অতি ধীরকণ্ঠেই উত্তর দিলাম,—আমি।

আমার পায়ের কাছে একজন কেউ বসেছিল বলে মনে হলো, এবার উঠে দাঁড়ালো, বলল,—কে, জ্যেঠামশাই?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে?

ভয়ানক চমকে উঠেছিলাম ভাই বিশ্বনাথ। কেন এ চমক, তা তোমাকে পরে বলছি।

—আমি কে?—হেসে উঠল, তারপরে বলল,—আলোয় আসুন ত?

হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের কাছে আলোর নীচে, বলল,—এইবার দেখুন ত?

ভালো করে দেখে হেসে উঠলাম, বললাম—ও তুমি অপর্ণা? বেশ মানিয়েছে ত ফুলের সাজে! ওকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছি, আর ভিতরটা ধক্ ধক্ করে উঠছে! কার কথা আচমকা মনে পড়ল জানো? আমার ছেলে, মানিক? তার মায়ের কথা! অর্থাৎ কণার জ্যেঠাইমার কথা। চিরকালই কি সে অমন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় শুয়েছিল? তা নয়।

শোন তাহলে। প্রথম থেকেই বলি। অপর্ণা ঐ অন্ধকারে গাছের ছায়ায় বসে কার অপেক্ষা করছিল জানি না, কিন্তু অমন ফুলের সাজে অমন ভাবে ওকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো, এ যা দেখছি—কিছুই সত্য নয়। ঐ প্যান্‌জির চারা, জিনিয়া, কস্‌মস্, করোনেশন, হলিহক্ ক্রাইসেনথিমাম্, ঐ ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের সারি, ঐ মাঠ, ঐ বাড়ি, ঐ গাছপালা, ওগুলি মিথ্যা—ওগুলি স্বপ্ন, যেন জেগে উঠে হাত বাড়ালেই শূন্যে মিলিয়ে যাবে!

আর কী আশ্চর্য, ঠিক তার পরেই অনুভব করলাম, অনেকগুলি কণ্ঠস্বর যেন ঝঙ্কার হয়ে কানে এসে বাজল! অনেক আলো যেন জ্বলে উঠল! অনেক লোক, অনেক কোলাহল, অনেক ব্যস্ততা।

তারপর বিশ্বনাথ, প্রায় ঘণ্টা তিনেকের কথা আমি তোমাকে ঠিক বলতে পারব না। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল জানি না, তোমাদের অভিনয়ও ঠিক দেখতে পারলাম না। অভিনয় শেষ হলো, লোকজন এক এক করে সবাই চলে গেল, আমি তোমাদের অলক্ষ্যে চলে এলাম তোমাদের এই অন্ধকার ষ্টেজের ওপরে। তখনো আমার স্বপ্নের ঘোর কাটেনি! তোমাদের নাটকে ঐ যে বৃদ্ধের কথাটি আছে, আমি যেন ঠিক তার মতো হয়ে গেছি! নির্জন ষ্টেজটার ওপরে বসে থাকতে থাকতে মনে হলো—সানাই বাজছে। ভারী মিষ্টি আর মৃত্বু সেই সুরের মূর্চ্ছনা! আর আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন শুয়ে আছি একটা ঘরে, বাইরে অনেক লোকের পদশব্দ পাচ্ছি, অনেক হাঁকডাকও শুনতে পাচ্ছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কাউকেই! তারপর একসময় ধীরে ধীরে সব নীরব হয়ে এলো। বাইরে কোথাও রজনীগন্ধা ফুটেছে বোধহয়—তারই অন্তরস্পর্শী গন্ধ ঢেউ তুলে ভেসে আসছে শুধু!

খুট করে দরজায় একটু শব্দ, কে যেন ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ করল, তারপরে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো আমার কাছে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, বাইরে কাকও ডাকছে বোধহয় তু-একটা,—আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি না বিশ্বনাথ, যাকে দেখলাম, তাকে যে আবার কোনোদিন ও ভাবে দেখব, তা ভাবতেই পারি নি! সেই আমাদের বিয়ের প্রথম দিককার রাতগুলোয় ওকে যেমন দেখেছি, একেবারে ঠিক সেই রকম। আমি যেন চমকে উঠে বসলাম বিছানায়, অস্ফুটস্বরে বললাম,—তুমি!

সে একটু সলজ্জ হাসল শুধু। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল তাকে! ঝকঝকে জরির চুমকি বসানো একটা লাল শাড়ী জড়ানো সর্বাঙ্গে, গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, কালো কুঞ্চিত কেশরাশি, সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁত্বর-রেখা প্রসারিত হয়ে গেছে, ছোট্ট ললাটটিতে টানাটানা তুই ভ্রূর

মাঝখানে গোল করে সিঁদূরের টিপ ছোঁয়ানো! ঐ চমৎকার ভাসাভাসা ভাবময় চক্ষু, দুই ভ্রূর দুই প্রান্ত দিয়ে রক্তিম কপোল পর্যন্ত নেমে এসেছে শ্বেত চন্দনের বিন্দু বিন্দু ফোঁটা, আর লীলায়িত ভঙ্গীতে তুলে দেওয়া একটু ঘোমটা—ওকে যে কী অপরূপ দেখাচ্ছিল, তা আমি ভাষায় বোঝাতে পারছি না! দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে কেটে গেল অনেকক্ষণ। তারপরে সে কথা কইল, ঠিক যেন গানের সুর এসে ছুঁয়ে গেল আমাকে, বলল —এখনো ঘুমোও নি?

—না। কিন্তু এতো দেরী করে আসতে হয় বুঝি?

একটু হেসে একেবারে আমার কাছে এসে বসল, তোমাকে আর অপর্ণাকে পাশাপাশি দেখেছি বিশ্বনাথ, তাই তুমি বুঝবে বলে তোমাকে আজ সবই বলতে ভরসা পাচ্ছি,—আমার হাতের মধ্যে ধরা দিলো তার নরম হাতখানি। তারপর অতি আদরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আমার মাথায়, গালে, কপালে। খুব ধীরে ধীরে সে আবার কথা কইল, বলল,—বাড়ির সবাই না ঘুমুলে কেমন করে আসি, বলো ত? আমার বুঝি লজ্জা করে না?

টেনে নিলাম বুকের মধ্যে, বললাম,—এমন চমৎকার সাজিয়ে দিলো কে, আজ?

—দিদিমা।

বহুক্ষণ যেন এইভাবে কেটে গেল চুপচাপ। বাইরে জ্যোৎস্নার কী রূপ! রজনীগন্ধার গন্ধ ব্যাকুল হয়ে ঘুরছে যেন!…হঠাৎ একসময় ধড়মড় করে উঠে বসল সে, বলল,—ভোর হয়ে আসছে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি, কেমন?

—না।

—লক্ষ্মীটি! বাড়ির সবাই এখুনি জেগে উঠবে।

—না।

—না কেন? আমি যাই, অবুঝ হয়ো না।

—না।

কিন্তু শুনল না। চলে গেল। অভিমান হলো ভয়ানক, পাশ ফিরে শুয়ে রইলাম। আর কখনো কথা বলব না, যতই সাধাসাধি করুক না কেন!

কিছুক্ষণ পরে কে যেন কাছে এলো। মনে হচ্ছিল, কে যেন আমাকে স্পর্শও করল, বলল,—শুনছেন?

চোখ ফেললাম না।

—শুনছেন?

পাশ ফিরেই দেখি,—এক অদ্ভুত মূর্তি! মিশ কালো দেহের বর্ণ, বিরাট চেহারা, গায়ে বেশ জমকালো পোষাক, হাতে একটা দণ্ড। বলল, উঠুন, এবার উঠতে হবে আপনাকে!

উঠলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, এ আমি কোথায়? মনে হলো, আছি এক অন্ধকার ঘরে, একবিন্দু আলো নেই কোথাও।

—শুনছেন?

বোকার মতো চাইলাম সেই অদ্ভুত মূর্তিটির দিকে।

—শুনছেন?

এবার উত্তরে আমার সমস্ত প্রাণমন হাহাকারে ভেঙে পড়ল যেন, বললাম—নিয়ে যাও, আমার যা কিছু আছে, সব নিয়ে যাও, আমার অর্থ-সম্পদ, বাড়িঘর সব কিছু! শুধু একটিবার, শুধু আর একটিবার আমার মাণিকের মাকে আমার সামনে এনে দাও, আমি আর কিছুই চাই না।

মহাকাল নিরুত্তর।

—শুনছেন?

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সেই নিশ্চল কঠিনতার দিকে।

—শুনছেন? জ্যেঠামশাই, ও জ্যেঠামশাই?

চমকে উঠে বললাম,—কে?

—আমি কেষ্ট। কী সর্বনাশ করেছেন জ্যেঠামশাই, এই শেষরাত পর্যন্ত এই স্টেজের মধ্যে চেয়ারে কাটিয়েছেন! কী হয়েছিল আপনার! মারা পড়বেন যে!

চোখ মেললাম ভালো করে। দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো তুমি আর কেষ্ট। ভয় পেয়েছিলে বুঝি আমার অবস্থা দেখে? না, বিশ্বনাথ···না, না, মরব না,—বেঁচেই আছি।

জ্যেঠামশায়ের কাছ থেকে যখন বাড়ি ফিরল বিশ্বনাথ তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। আবছা আলোয় পথরেখা খুঁজে নিয়ে দুএকজন সেই দূরের কারখানায় ডিউটীতে যাচ্ছে। বিশ্বনাথ সেদিনটাও ছুটী নিয়েছিল, সুতরাং ওর কোনো তাড়া ছিল না।

সাঁওতালদের পাড়ায় মুরগী ডাকছে, বিশ্বনাথদের ঘরের সামনের কুর্চিগাছে এক ঝাঁক ছাতার পাখী উড়ে এসে বসেছে। ওদের বাড়ির প্রবেশপথে দরজা খুললে প্রথমেই পড়ে ওর নিজের ঘরখানা। কড়া নাড়ল বিশ্বনাথ, অনুচ্চকণ্ঠে ডাকল সে,—বিপিন—বিপিন?

দরজা সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল, কিন্তু বিপিন নয়, দরজা খুলে দিলো আরেকজন। ও যে অমনভাবে এসে দরজা খুলে দেবে, বিশ্বনাথ তা ধারণাও করতে পারে নি।

অনুচ্চকণ্ঠে সে বলে উঠল,—বিপিন কোথায়?

অপর্ণা বললে—ভিতরের দাওয়ায় ঘুমুচ্ছে।

—মা উঠেছে?

অপর্ণা বললে,—না, বুড়োমানুষ, ঐ অত রাত্রে থিয়েটার দেখে ফিরেছেন, এরই মধ্যে উঠবেন কী করে?

দরজাটা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে এলো বিশ্বনাথ। ওর মনে হচ্ছিল, কী আশ্চর্য সুন্দরই না দেখাচ্ছে অপর্ণাকে। সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে আসা মুখখানার ওপর বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের

আলো এসে পড়েছে, ওর ভাব-ভঙ্গিতে একটা অলস শৈথিল্য! দেখতে দেখতে সংযমের বাঁধ সত্যিই হারিয়ে ফেলতে হয়।

মুহূর্তেই সব ভুলে ওকে টেনে নিলো সে বুকের কাছে। অপর্ণা নিজেকে তখনি ছাড়িয়ে নিলো না বটে, কিন্তু ওর আগ্রহান্বিত ওষ্ঠের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে চট্ করে নামিয়ে নিলো মুখ, ওর কুমারী সিঁথির অগ্রভাগে দুই দ্বিধাবিভক্ত কেশ-বন্যার ঢেউ ঈষৎ উঁচু হয়ে দুপাশে যেখানে নেমে গেছে, সেইখানে ওর উদ্যত চুম্বন এসে ভেঙে পড়ে অবশেষে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

নির্বাক কয়েকটি স্বাপ্নিল মুহূর্ত! তারপরেই ভঙ্গীতে ঈষৎ চাঞ্চল্য এনে অস্ফুটকণ্ঠে অপর্ণা বললে—ছাড়ো।

—ছাড়ব না।

—এই দেখ, ভয়ানক দুষ্টু ত?

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো অপর্ণা, তারপরে দুটি আয়ত চোখে যেন নেমে এলো তিরস্কারের ঘন ছায়া, অস্ফুট চাপা কণ্ঠেই সে বলে উঠল—দিন দিন সাহস বাড়ছে দেখছি।

চট করে ওর হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিলো বিশ্বনাথ, তারপরে মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল, ভালবাসি।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন করে ভেঙে পড়ে তীরভূমিতে, তেমনি করে হঠাৎ ওর বুকে এসে মুখ লুকালো অপর্ণা। আলগা হয়ে বাঁধভাঙা বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ল নরম আর কালো কেশের ঢেউ। অস্ফুট কাঁপা গলায় অপর্ণা বললে,—আমার ভয় করে।

—কেন?

অপর্ণা বললে—তুমি যতো অধীর হচ্ছো, আমার ততই মনে হচ্ছে,— যেন ভেঙে যাবে সব! যতো কাছে আসছ তুমি, ততই ভয় পাচ্ছি, ছিট্‌কে যদি দূরে সরে যেতে হয় দুজনকে!

বিশ্বনাথবাবু হেসে বললে,—এ তোমার মিথ্যে ভয়।

—না গো না,—মুখ তুলল অপর্ণা, বলল,—তুমি বোঝো না। ভালবাসায় নাকি অভিশাপ আছে।

—কে বললে তোমাকে ?

—একটা বইতে পড়েছি,—নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এবার একটু সরে দাঁড়ালো অপর্ণা, বললে,—আমার মন কী বলছে, জানো ? বাধা আসবে চারদিক থেকে।

—বাধা ! কী বলছো তুমি ?

—হ্যাঁ।—অদ্ভুত কান্নাভরা কণ্ঠে বলতে লাগল অপর্ণা,—ওগো আমি বন্দিনী। তুমি কাছে এলে ভয় পেয়ে অমনি চারদিকে তাকাই,—কেউ দেখছে না ত ! কত অনুচ্চারিত বিধিনিষেধ যে আমাকে ঘিরে আছে !

বিশ্বনাথ অবাক হয়ে বললে—তোমাকে-আমাকে নিয়ে কীসের আবার বিধিনিষেধ ? অভিভাবকদের কারুরই ত অমত নেই ?

অপর্ণা বলতে লাগল—সম্বন্ধ করে বিয়ে এক জিনিষ। কিন্তু বিয়ে স্থির হয়ে আছে, দুজনে দুজনের সঙ্গে মিশছে, এটা আবার সবাই সহ্য করতে পারে না, তা জানো ?

বিশ্বনাথকে নিরুত্তর দেখে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন অন্বেষণ করছে অপর্ণা, আবার বললে সে,—কিছুই বলা যায় না বাধা আসবে কোথা থেকে !

বিশ্বনাথ বললে—আমার মা বাধা দেবে না, আমি জানি।

—এও আগে থেকে বলা যায় না।

সবিস্ময়ে বিশ্বনাথ বললে,—তার মানে ! আমার মায়ের মনের কথা আমি জানি না, আর তুমি—

বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে অপর্ণা বললে,—শোনো। ভালবাসাটা মেয়েদের কাছে সমস্যা, তোমাদের কাছে নয়। আমাদের কথা আমরা যতটা জানি, তোমরা ততটা জানো না। কিন্তু, কেন ভাবছ এ সব কথা ? তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব বলেই ত কাল

রাত্রে মার কাছে শোবার ছল করলাম। লক্ষ্মীটি, আমাকে বোঝবার চেষ্টা করো।

—বেশ, বলো।

কিন্তু আশ্চর্য অপর্ণার স্নিগ্ধ মুখখানা! স্নেহে-মমতায় অপূর্ব কোমল হয়ে এলো ওর মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি, বললে,—রাগ করো না। আমাকে তোমার অনুক্ষণ কাছে পেতে ইচ্ছা করে, আমি তা জানি। কিন্তু—

বিশ্বনাথ বাধা দিয়ে বললে,—কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করবে না, এই ত ?

অপর্ণা কোমলকণ্ঠে বললে—করব! কিন্তু দেখ, যেভাবে ছিলাম, সেটাই কী এখন ভালো নয় ?

—কী ভাবে ছিলাম ?

অপর্ণা—কেন, কেন, তোমার দিনপঞ্জীর খাতা ? আমার চিঠি, তোমার চিঠি !

বলতে বলতে চাপা হাসির আভায় ঝলমল করে উঠল ওর মুখ, —বলল,—তুটি মেয়ে একটি ছেলেকেই তুদিক থেকে দেখল,—একজন দেখল তার ভিতরের দিক, আরেকজন বাইরের। হ্যাঁ গো, কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, তোমার মিনতিই তোমাকে শুধু চিনল, অপর্ণা নয় ?

বিশ্বনাথ বললে—তার প্রমাণ কোথায় পেলাম !

মুখ টিপে আবার একটু হাসল অপর্ণা, বললে—থাক, থাক, আর রাগ করতে হবে না! হুজুরে হাজির ত সর্বক্ষণই আছি !···

বিশ্বনাথের মনটা যেন তুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে, তার প্রেম ও মানসিক জীবন, প্রিয়া ও শিল্পচর্চার প্রেরণা, অন্য-দিকে কঠিন সংসার, কঠোর বাস্তবতার দিক, তার কারখানার জীবন! এ জীবন তার ভালো লাগে না, সে হাঁপিয়ে ওঠে আর মনে মনে ভাবে, এই নিদারুণ অর্থকৃচ্ছতার মধ্যে প্রেমকে সে প্রতিষ্ঠিত

করবে কেমন করে, প্রিয়াকে সে স্বাগত জানাবে কেমন করে, সংসারে ? এই চিন্তাটাই তাকে দিনরাত ক্ষয় করে ফেলতে চায় !

ইতিমধ্যে একদিন অপর্ণা এলো এক অভূতপূর্ব খুসীর হিল্লোল বহন করে। মা তখন ছিলেন বিশ্বনাথের কাছে বসে।

বিশ্বনাথ বললে—কী, পরীক্ষার অ্যাডমিট্ কার্ড এসেছে বুঝি ?

অপর্ণা বললে—আহা, সে ত আগেই এসেছে! এ এসেছে অন্য জিনিষ! দেখছেন না চিঠি ? কণা আর অনুপমবাবু লিখেছে। কাল ওদের বিয়ে, কলকাতায়।

মা বললেন—তাই নাকি ! তা যাচ্ছ ত মা বিয়েতে ?

অপর্ণা বললে—না মা, পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে, সাতদিনের মধ্যে কলকাতা ত যেতে হবেই, কিন্তু বিয়েতে থাকবার সময় কোথায় ?

তারপরে, মা উঠে যাবার পর, অপর্ণা বিশ্বনাথকে নিম্নকণ্ঠে বললে—কলকাতায় কোথায় গিয়ে উঠব বলো ত? কাশীপুরে। তোমার মিনতির বাড়িতে। চলো না, পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বিশ্বনাথ বললে—তাহলেই হয়েছে। নির্ঘাৎ ফেল করবে।

মুখ ভার করে অপর্ণা বললে—বারে, বেশ লোক ত! একে ভয়ের অন্ত নেই, তার ওপরে ফেল-টেল যা তা সব বলছ !

বিশ্বনাথ বললে—আমাকে সঙ্গে নিলে, আমার কথাই চিন্তা করবে, পরীক্ষার খাতাতে আর লিখবে কী ? বিশ্বনাথের অষ্টোত্তর শতনাম।

— যাও, দুষ্টু কোথাকার !

বিশ্বনাথ হাসতে লাগল।

অপর্ণার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, বললে—খালি আমাকে ক্ষ্যাপানোর চেষ্টা! দাঁড়াও না, পরীক্ষাটা দিয়ে আসি, মজাটা দেখাবো একেবার !

সময় ত বসে থাকে না। তাই কণার বিয়েও যথাসময়ে হয়ে গেল, অপর্ণাও চলে গেল তার দাদার সঙ্গে কলকাতায়। কিন্তু, ও কী সত্যি সত্যি মিনতিদের বাড়ি গিয়ে উঠবে নাকি? মিনতির কথা মনে পড়তেই চমকে ওঠে বিশ্বনাথ, ভাবে, কী রকম ছিল সে তখন, আর আজই বা সে হয়েছে কী রকম! অপর্ণার সঙ্গে মিশে সে যেন কিশোর বালকের মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে! কোথায় গেল তার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য, আর স্বল্পবাক স্বভাবটা!

কিন্তু, সে ত গেল একদিক। অন্যদিকে, অপর্ণা নেই, কিছুই যেন তার ভালো লাগছে না। একজনের ভালবাসা সে নিতে পারে নি, তাই অন্যজনকে ভালবাসার ডালি দিয়ে তাকে বুঝি এমনি করেই ঋণশোধ করতে হচ্ছে!

ছোট কারখানাটার ছোট্ট একটি ঘরে বসে কাজ করতে করতে উদাস হয়ে যায় বিশ্বনাথ। ফাইলের স্তূপ ঠেলে ফেলে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরতে থাকে এদিক থেকে ওদিকে। সব ডিপার্টমেণ্টেই আছে ওর পরিচিতের দল।

যে যার নিজের কাজ করে চলেছে আপন মনে। দু একজনের কাছে গিয়ে সে একটু বসে, আবার তখখুনি উঠে পড়ে। তারপরে একসময় সে ক্যান্টিনে এল চা খেতে।

অসময়ে ক্যান্টিনে ভীড় নেই একেবারে, এককোণে বসে পরিচিত একটি লোক পকৌড়ি চিবুচ্ছে শালপাতার ঠোঙা থেকে, পাশে বেশ বড়ো কাঁচের গেলাসে এক গেলাসে ধূমায়িত চা। লোকটি ঢালাইয়ের কাজ করে, দুটো পা হাঁটু পর্যন্ত মোটা ক্যাম্বিশে ঢাকা, হাতেও মোটা দস্তানা ছিল, সেটা খুলে কোলে রেখেছে। চোখে ওয়েল্ডিং-চশমার মতো ফিতে বাঁধা চশমা, সেটা এখন গলায় ঝুলে রয়েছে। ওকে দেখে কলরব করে উঠল লোকটি, বলল,—আসুন আসুন, কী আশ্চর্য, অসময়ে চাঁদের উদয়! ওরে চা দে।—

একটু হেসে আসন গ্রহণ করল বিশ্বনাথ। ভদ্রলোকটির কোলাহল তখনো থামেনি, কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললে,—কী ব্যাপার দাদা, লোকালয়ে যে কান পাতা দায়!

—কী রকম?

চোখ নামিয়ে বললে,—প্রেমপর্ব কতদূর এগোল?

—মানে!

তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে উঠল সে, বলল,—বহুৎ আচ্ছা দাদা! এই ত মরদের বাচ্ছা! ছাড়বে কেন, টোপ যখন গিলেছে খেলিয়ে বেড়াও! কিন্তু খবরদার ভায়া, বিয়ে-সাদী করো না।

—কেন?

—কেন!—চায়ের গেলাশে চুমুক দিয়ে বললে,—আমি ভাই ঠকেছি জীবনে। প্রেম-করা মেয়েকে কখনো বিয়ে করতে নেই!

বিশ্বনাথ হেসে বললে,—বৌদির সঙ্গে আলাপ নেই, নইলে কথাটা তাঁকে বলে আসতুম।

হাসির উদ্বেল ঢেউ মুহূর্তে শুষে নিল কে যেন সে লোকটির মুখ থেকে, সঙ্গে সঙ্গেই সে গম্ভীর হয়ে গেল, বললে,—আলাপ নেই বুঝি?

—না ত। কবে আর আপনার বাড়ি নিয়ে গেলেন আমাকে!

—বাড়ি!—লোকটি অবাক হয়ে বিশ্বনাথের মুখের দিকে তাকালো, বলল—আপনি কী কিছুই জানেন না? কিছুই কি শোনেন নি আমার সম্বন্ধে?

—না ত, কী শুনব?

—বেশীদিন ত এখানে আসেন নি, তাই জানেন না। আমার হয়ে গেল অনেকদিন। যবে থেকে কারখানা খুলেছে ঠিক ততদিন। এ বড়ো পাজী যায়গা। চিমনীর কালো ধোঁয়া লেগে-লেগে যায়গাটাই শুধু কালো হয়ে যায় নি, মানুষের-মনও কালো হয়ে গেছে!

অদ্ভুত বিষণ্ণ দেখাতে লাগল লোকটির মুখ। বিশ্বনাথ ওর পুরো নাম জানে না, 'দাশবাবু' বলে লোকে ওকে ডাকে,—কথাবার্তায় মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটু টান পাওয়া যায়,—হয়ত চট্টগ্রাম থেকেই এসেছিলেন দাশবাবু। ছয় ফুটের মতো দীর্ঘ দেহ,—বাঙালীর পক্ষে বেশ অস্বাভাবিক ভালো স্বাস্থ্য। আগাগোড়া ক্যাম্বিশের পোষাকে নিজেকে ঢেকে এস্কিমোদের মতো চেহারায় ফার্ণেসের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করে লোকটা।

দাশবাবু বলতে লাগল,—কারখানায় সব আলোচনাই হয় মশাই। সবার হাঁড়ির খবরই লোকের মুখে মুখে। আপনার কথা জানলাম কেমন করে শুনবেন? আপনি নিজে ত আর বলেন নি? —অথচ, সবাই জানে। এমন কি ম্যানেজার রবার্ট পর্যন্ত জানে বলে আমার সন্দেহ হয়।

—বলেন কী!

—রবার্ট সাহেবের কাণ্ড জানেন না ত? ব্যাটা বুড়ো এই সব মুখরোচক গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে। তা সে যারই হোক, কুলি কামিনদের গল্পও কান পেতে ধৈর্য ধরে শোনে। কিন্তু যাকগে সাহেব-সুবোদের কথা, আপনি মশাই অবাক করলেন। কারখানায় কাজ করতে এসে কোনো খবরই রাখেন না,—এ আবার কী কথা? বলি, এই আমি যে এক মুণ্ডা মেয়েছেলে নিয়ে সংসার করি,—এ কেচ্ছাটুকুও কি আপনার কানে যায় নি?

বিশ্বনাথ অবাক হয়ে তাকাল ওর মুখের দিকে। দাশবাবু একটু ম্লান হেসে বলল,—চা খেয়ে নিন। বলছি সব। কিছুই জানেন না দেখছি!

ক্যান্‌টিনের পালা শেষ করে দুজনে কারখানার ভিতরে চলা শুরু করল।—ওর ভারী বুটের শব্দে মুখর হয়ে উঠল কনক্রীট্‌-বাঁধা চলার পথ।

হঠাৎ একটা লাইটপোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো দাশবাবু,

তারপর পকেটের একটা কৌটা থেকে একটা বিড়ি বার করে নিজেই ধরালো বিড়িটা, তারপর বলল,—হ্যাঁ ভাই, মুণ্ডা মেয়ে নিয়ে থাকি। বেশ আছি। বাঙালী মেয়ে আমার ধাতে সইল না! তাই ত বলি ভাই, প্রেম করো, বিয়ে করো না।

একটু হেসে একটু লজ্জিত ভঙ্গীতে বিশ্বনাথ বলল,—আমার সম্বন্ধে কী শুনেছেন জানি না,—তবে এটুকু বলতে পারি, মারাত্মক কিছু না!

—দোষ কী ভাই?—দাশবাবু বলতে লাগল,— লেখাপড়া শিখি নি, সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব না, তবে এটুকু বলব, এ কারখানার সব শালা প্রেম করে! কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে, কেউ সবার সামনে বুক ফুলিয়ে! তুমি যদি কিছু করে থাকো ত, কী দোষটা করলে ভাই?

বিশ্বনাথ একটু হেসে বললে,—আমাব কথা ছেড়ে দিন।

বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ খপ করে ধরে ফেসল সে বিশ্বনাথের হাতটা, বললে,—কিন্তু খবরদার ভাই, বিয়ে করো না। ওসব মেয়ে বিয়ে করলেই পস্তাবে!—প্রেম আমিও করেছিলাম, কী হলো তারপর?

বিশ্বনাথ সাগ্রহে বললে—বলুন না কী হলো?

একটুক্ষণ থেমে থাকবার পর দাশবাবু বলতে লাগল,—ডিউটির সময় হয়ে গেল, ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে তোমাকে পারব না। তুমি বৌদি বৌদি করছিলে না? এসো না ভাই একদিন তোমার বৌদির সঙ্গে আলাপ করে? আমি দূর থেকেই খুপরীটা দেখিয়ে দেবো'খন।

—বৌদি, মানে, আপনার স্ত্রীর কথা বলছেন?

—স্ত্রী!—দাশবাবুর চোখদুটো যেন মুহূর্তে জ্বলে উঠল,— একেবারে প্রেম করে বিয়ে করা স্ত্রী। পড়ে পড়ে মাতাল স্বামীর হাতে মার খেতো, আমি টেনে নিয়ে এলাম বাইরে, মুসলমান

হয়ে বিয়ে করলাম, আবার শুদ্ধি করে হিন্দু হলাম দুজনে। পালিয়ে চলে এলাম এখানে, এই কারখানায়। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে ঢালাইরের কাজ করছি কিন্তু সে কার জন্য, বলতে পারিস ভাই?

বলতে বলতে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। কোনক্রমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে দাশবাবু বললে,—অথচ, সে কী করল জানিস? দোকান খুলে বসেছে। এই কারখানার সব শালা সেই দোকানে যায়, আমি টের পাই না ভাবিস?

—মানে!

—মানে?—লোকটি অদ্ভুত হাসল, বললে,—একদিন গোটা-কয়েক টাকা হাতে নিয়ে যাস ওর কাছে, মানেটা টের পাবি!

বলেই ভঙ্গীতে চাঞ্চল্য এনে দুপা এগিয়ে গেল, একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপরে মুখ ফিরিয়ে বললে,—চললাম ভাই, দেরী হয়ে গেলে ফোরম্যান-শালা চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে!

বুটের তলায় বাঁধানো লোহার খুরে খটাখট্ শব্দ তুলে চলে গেল দাশবাবু। আর, আমি অবাক হয়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। ওর বিষণ্ণতা আমাকেও ছুঁয়ে গেল বুঝি!

তারপরে কেটে গেছে আরও কয়েকটা দিন।

এ অঞ্চলে 'নাগা' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। কাজে না যাওয়া অর্থাৎ কারখানায় অনুপস্থিত থাকাটাকে এখানে নাগা বলে। বিশ্বনাথের কাছে খুব কৌতুককর লাগত কথাটা। বুৎপত্তিগত অর্থ কী কথাটার? তা সে জানে না। ছেলেবেলায় ওদের বাড়িতে একটি বুড়ী ঝি ছিল, সে রাগ করাকে বলত 'নাগ' করা। বলত, বাবু নাগ করেছে।—

আজ, কারখানায় ছুটী নিয়ে অসময়ে বাড়ির দিকে চলেছে বিশ্বনাথ, আপন মনে ভাবতে ভাবতে চলেছে এই সব কথা। বাবু

নাগ করেছে।—এই নাগ করার সঙ্গে কারখানার নাগা করার সম্বন্ধ আছে নাকি? বিশ্বনাথ ত আজ একবেলা নাগা করল, অর্থাৎ কি না, কাজের ওপর একবেলা রাগ করল, ব্যাখ্যা এভাবেও ত করা যেতে পারে?

রাগ করেছি গো, কাজের ওপর রাগ করেছি!—কিন্তু, বিশ্বনাথ কাকে গিয়ে বলবে ওই কথা?

সে ত কলকাতায় পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু, কবে শেষ হচ্ছে পরীক্ষা? শেষ হচ্ছে, না হয়ে গেছে?

দাশবাবুর কাহিনী শুনে সে বয়সে মনে মনে শিউরে উঠেছিল বিশ্বনাথ, কারণ—জটীল জীবনের যে বিচিত্র চিত্র সেদিন ওর সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল,—ওর মন তা মেনে নিতে পারে নি। সে ভাবছিল, এই জটীলতার উর্ধ্বে কি বাস করা চলে না?

ভেজানো ছিল ঘরের দরজা। ঘরে ঢুকে ওর ঘর পেরিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারটা দাওয়ায় ঠক্ করে রেখে দিয়ে মায়ের ঘরের দিকে গেল বিশ্বনাথ।

—মা ওর সাড়া পেয়েই বলে উঠেছেন—কে রে, বিশু এলি?

মার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ও ঢুকে পড়ল ঘরে। বিছানায় মা শুয়ে আছে, আর অপর্ণা শিয়রে বসে চিরুণী নিয়ে মায়ের চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশ্বনাথকে অসময়ে বাড়ি ফিরতে দেখে দুজনেই বেশ চমকে উঠেছিল।

মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল,—হ্যাঁরে, শরীর ভালো ত?

বিশ্বনাথ বলে ফেলল,—না, ভালো লাগছে না,—

তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন মা, বললেন—সে কীরে! বিছানা করে দিচ্ছি, শুয়ে পড়। জ্বরটর নয় ত? দাঁড়া, আসছি।

বাধা দিয়ে বলে উঠল অপর্ণা—আমি দেখছি মাসীমা। আপনারও শরীর ভালো না, শুয়ে থাকুন। আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি।

—সে-ই ভালো মা,—মা বললে,—আমি বুড়োমানুষ, আমি আর পারি না ও ছেলেকে নিয়ে।

বিশ্বনাথ বারান্দায় পোষাক বদলাতে বদলাতে শুনতে পাচ্ছে, অপর্ণা বলছে,—ভাববেন না, একটু জ্বর হয়ত হয়েছে, সব ঠিক হয়ে যাবে!

কিন্তু, বিশ্বনাথ ভাবছে, কবে ওর পরীক্ষা শেষ হলো, কবে ও ফিরে এলো? ও চলে যাবার পর কতোদিন কেটে গেছে? দুসপ্তাহ, না, তিনসপ্তাহ?

হ্যাঁ, তাই হবে। হিসাব করে দেখল বিশ্বনাথ, তিনসপ্তাহের ওপর কেটে গেছে।

যাই হোক, বারান্দা থেকে বাথরুমে চলে গেল বিশ্বনাথ, তারপরে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে,—বিছানা পেতে দিয়ে মার ঘরে চলে গেছে অপর্ণা।—একটা চাদর গায়ের ওপর টেনে নিয়ে সত্যিসত্যিই শুয়ে পড়ল বিশ্বনাথ, এবং তারপরেই অপর্ণা ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালো ওর শিয়রে, বললে,—জ্বর নাকি?

উত্তর দিল না বিশ্বনাথ।

কপালে আস্তে হাতখানা রেখে তরলকণ্ঠে বলে উঠল অপর্ণা,—একেবারে ঠাণ্ডা। জ্বর কোথায়?

কপাল থেকে হাতখানা উঠিয়ে বুকের উপর টেনে নিয়ে এলো বিশ্বনাথ, বললে—এবার দেখ ত?

চারদিকে সভয়ে তাকিয়ে জোর করে ছাড়িয়ে নিলো হাতখানা তারপর অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে,—পরীক্ষা দিয়ে এলাম। কেমন দিয়ে এলাম সে-সব কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই বুঝি?

বিশ্বনাথ বললে—তাই ত করছি। এবার আর বাধা নেই ত?

ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল অপর্ণার মুখ, বললে,—জানি না, যাও।

—বলো না?

অপর্ণা বললে,—সকালে দাদা এসেছিলেন মার কাছে।

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বিশ্বনাথ বললে—তাই নাকি!

—হ্যাঁ।

—দেখো, এবার তোমার জুতোয় আবার পেরেক উঠবে না ত?

বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে, বললে—হেঁয়ালী ছেড়ে শীগগির সব খুলে বলো। মরে যাচ্ছি!

—আঃ! আস্তে! ও ঘরে মা রয়েছেন না!

—বলো শীগগির?

তেমনি ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল কৌতুকময়ী, বললে,—তুমি যে স্রেফ বিয়ে করে মার কাছে এসে বলবে, 'মা আমি বিয়ে করেছি', —সেটা আর হলো না, এই আর কী!

ওর দুটো হাত ধরে বিশ্বনাথ বলে উঠল,—আর দেরী সইছে না! শীগগির বলো সব খুলে!

হাত ছাড়িয়ে তীরস্কার করে উঠল অপর্ণা,—আবার দুষ্টুমি!

—সে কী সাধে!

অপর্ণা বললে,—দাদা যাকে বলে 'প্রপোজ করা' তাই করে গেছেন মার কাছে। হিষ্ট্রি রিপিটস্ ইট্ সেল্ফ!

—আর মা?

উজ্জ্বল হাসির বিভায় ভরে উঠল মুখখানা, অপর্ণা বললে,—কী চমৎকার আমাদের মা! তখখুনি এলেন আমাদের বাড়ি। বৌদি কতো বললেন,—দিন ক্ষণ আছে ত! উনি বললেন,—আমি কিছু মানি না! এতকাল চুপ করে ছিলাম। এবার আমার মন যা চাইছে, তাই করব!

—কী করলেন?

দুটি হাত প্রসারিত করে অপর্ণা বললে—কাঁকন দুটি এখনো চোখে পড়ে নি? এ-তো মায়ের হাতের কাঁকন! একেবারে আশীর্বাদ করে এলেন আমাকে।

—আমার মা!

—হ্যাঁ, আমারও মা।—অপর্ণা বললে—ছাড়লেন না, আমাকে নিয়ে এলেন বাড়ি, বৌদিকে বলে এলেন, ওকে নিয়ে গেলাম, সারাদিন আজ আমার বাড়ি থাকবে!

—আর তোমার বাবা, তোমার দাদা-বৌদি?

—খুব খুশী হয়েছেন।

বিশ্বনাথ বললে,—হ্যাঁ গো, আর কী-কী বললেন মা?

অপর্ণা বললে,—মা যে এতো ভালো, এত উদার, আমি জানতাম না। আমাকে কী বললেন জানো? বললেন,—দেখ, আমার সামনে তোমরা দুজনে খবরদার লজ্জা করবে না, আমার সামনে দুটিতে ঘুরঘুর করবে, কথাটথা কইবে!

—মা বললেন!

—হ্যাঁ।

কয়েক মুহূর্ত কাটল নীরবে। বিশ্বনাথ বললে—তারপর?

—বরপক্ষ-কন্যাপক্ষ, দুপক্ষই ঘোরতর আধুনিক। দাদাও আসছে বিকেলে তোমাকে আশীর্বাদ করতে।

—তারপর?

—তারপর? অপেক্ষা কর আর সাতটা দিন। কিন্তু তুমি ত সব শুনেই গেলে, কিছু বললে না ত?

—কী বলব?

অপর্ণা হেসে বলল,—কেন, কোনো উপদেশ?

—না, তার দরকার হবে না।

ওর মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল অপর্ণা।

বললে,—যতটা খুশি হবে ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা খুশী দেখাচ্ছে না ত? আজ কিছু হয়েছে নাকি অফিসে?

দাশবাবুর কথাটা মুহূর্তে মনের ওপর ছায়া ফেলে সরে গেল, কিন্তু সেটা মুছে ফেলে বিশ্বনাথ বললে—না ত! এমনি চলে এলাম ছুটী নিয়ে কাজের ওপর আজ রাগ করেছি।

অপর্ণা বললে,—চলো, মার কাছে গিয়ে বসবে।

—চলো।

অপর্ণা বললে—আচ্ছা? মিনুদির কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলে না?

বিশ্বনাথ বললে—কী বললে মিনু?

—বললে, দাদার বিয়ের সময় খবর দিস, যাবো।

—ওকে আনাবো, কি বলো?

অপর্ণা বললে—আর কণা?

বিশ্বনাথ বললে—কলকাতায় দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে?

অপর্ণা বললে—ওমা, দেখা হয়নি? অনুপমবাবু চাকরী পেয়েছেন, জানো? কণার চেহারা একটু ভালো হয়েছে। আমি বললাম—বেশ মানুষ, অমন না বলে চলে আসতে হয়? ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে—কী শাস্তি দিবি, দে! ভালো কথা, আরেকটা খবর জানো? গোবরডাঙা না কী একটা জায়গা আছে? সেখানে বাড়ি কিনেছেন সুব্রতবাবু, অনুপমবাবুর বাবা। তিনি সেখানে চলে যাচ্ছেন ওদের নিয়ে। অনুপমবাবু থাকবেন মেসে, সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি যাবেন। সুব্রতবাবু সেখানকার স্কুলে মাষ্টারী করবেন, আর, ইতিমধ্যে কী-একটা ইতিহাসের বই লিখেছেন তিনি, খুব নাম হয়েছে বইটার, খুব বিক্রী হচ্ছে।

সাতদিন পরের ঘটনা নয় বহুদিন পরের ঘটনা। বোধহয় দেড় বছর, কী তারও বেশী। কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। আয় বাড়ানোর জন্য কার্মাটাড় ছেড়ে চলে এসেছে বিশ্বনাথ, কলকাতায়। ঠিক কলকাতায় নয়, কলকাতার দক্ষিণে শহরতলীতে। কিন্তু নিছক দৈনন্দিনতার কথা বলবার জন্য এ কাহিনীর অবতারণা নয় তাই সে সব বৃত্তান্ত না বলে ওদের দুজনের কথাই বলা যাক।

অনুপম মেসে থাকে, কণা থাকে শ্বশুরবাড়িতে, গোবরডাঙায়। তার কোল আলো করে একটা ছেলে এসেছে। তার চিঠি মাঝে মাঝে পায় অপর্ণা। বাচ্চাটার ফটো দেখিয়ে গেছেন অনুপমবাবু এসে, বাচ্চাটাকে সে চোখে দেখেনি অবশ্য। আর, অপর্ণা?

সেদিন চাঁদ উঠেছিল অনেক রাত্রে। আম্র-বীথির সারি চলে গেছে। বোধহয় বসন্তের প্রথম মুকুলের গন্ধে বাতাস বিভ্রান্ত। ভালো করে চোখ মেলতেই চমক ভাঙল। টেবিলে মৃদু আলোটা জ্বলছে, সামনে অসমাপ্ত একটা ছবির স্কেচ। কখন যে আঁকতে আঁকতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বিশ্বনাথ, তার ঠিক নেই।

উঠল সে। আলোটা নিভিয়ে এগিয়ে গেল খাটের কাছে। এ পাশেই মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে আছে অপর্ণা। ডান হাতের করপল্লবের ওপর মাথা রেখে এলিয়ে আছে। বাহু প্রান্তে ভাঁজ পড়েছে, চুড়ি দুখানা একটু নেমে এসেছে কব্জির কাছ থেকে।

কাছে বসল বিশ্বনাথ। কিন্তু, স্পর্শ করতে ইচ্ছা করল না।

কিছুক্ষণ মাত্র। হঠাৎ খুলে গেল ওর চোখ, ঠোট দুটি চাপা হাসির আবেগে কেঁপে উঠল, বললে,—আমি বুঝি ঘুমিয়েছি?

—আশ্চর্য, তাহলে করছিলে কী?

—চুপ করে শুয়ে একজনের রকম দেখছিলাম।

—কী দেখলে?

—রাগের বহর। রাগ করে ছবি আঁকা! আমি ওখান থেকে সব দেখছি।

—ভারী কাজ করছ! আমি এখান থেকে দেখছি লঘু মেঘ, ভেসে যাওয়া আকাশ, আমের বাগান।

—তাই বই কি!

—তার মানে?

মুখ টিপে হাসল অপর্ণা, বললে,—আকাশ-বাগানই যদি দেখবে, তবে হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কে?

—বলো, বলো তাকিয়ে ছিলাম, আরও অনেক কিছু করছিলাম, বলো, বলে যাও।

—আহা, যেন আমি মিথ্যা বলছি! আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনছিল কে, শুনি?

হেসে উঠল অপর্ণা। চোখ পাকিয়ে বিশ্বনাথ বললে,—এই খবরদার!

—চেঁচিও না, এখখুনি খোকা উঠে পড়বে।

—উঠুক গিয়ে।

—হ্যাঁ, তা হলেই চিত্তির। সারারাত ঘুমের দফা শেষ! তোমার আর কি, এখ্‌খুনি পড়ে পড়ে ঘুমোবে, মরব আমি। যে তোমার ছেলে, সারারাত খালি ট্যাঁ-ট্যাঁ, ভালো লাগে না বাপু। হবে না-ই বা কেন, যেমন বাপ তেমনি ছেলে হবে ত!

—তার মানে? আমি কি ওর মতো সারাক্ষণ তোমার পিছনে ট্যাঁ-ট্যা করে বেড়াই নাকি!

—বাকীটাই বা রাখো কী! পিছনে ঘুরঘুর করে বেড়ানো, ছল করে কাছে ডাকা, মাকে লুকিয়ে দুষ্টুমী করা,—এ গুলি করে কে?

—আচ্ছা, মনে থাকে যেন! সারাদিন অফিসে ছটফট করে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরি, তাইতেই এত কথা! বেশ, আর শীগগীর নয়, রাত করেই বাড়ি ফিরব।

—ঈস্, আবার ভয় দেখানো হচ্ছে!

—দেখো তুমি।

একটা আলস্যের ঢেউ তুলে অপর্ণা উঠে বসল, ঠিক করে নিলো শাড়ীটা, এলোমেলো চুলের রাশি মাথার পিছনে গুছিয়ে নিয়ে দুইহাত পিছনে হেলিয়ে একটা আলগা খোঁপা বেঁধে নিল, তারপরে হাত দুটি স্বামীর কাঁধের উপর দিয়ে নামিয়ে আনল বুকের কাছে, বলল,—হ্যাঁ গো, রাগ করলে?

বিশ্বনাথ উত্তর দিলো না। ওর সান্নিধ্য আরো ঘন হয়ে এসে অপর্ণা বলল,—তুমি ভারী ছেলেমানুষ! কী একটা ঠাট্টার কথা বলেছি, তাইতেই বুঝি মানুষ এত রাগ করে? তুমি ত জানো না, সারাটা দিন আমি কেমন করে কাটাই! কাজকর্ম, শোওয়া-বসা কিছুতেই স্বস্তি নেই।

—সে ত তখন! এর আগে ত দিব্যি স্কুল মাষ্টারী করছিলে!

অপর্ণা স্থানীয় গার্লস্ স্কুলে কাজ করে, বলে—বসে থাকব কেন শুধু শুধু? চাকরী করলে দুপয়সার সাশ্রয় হয়। এর পর প্রাইভেটে বি-এ টাও দেবো, কেমন?

বিশ্বনাথ বললে—না, কোনো কথা নয়, এসো, আজ এই চমৎকার রাতটা আমরা শুধু জেগে গল্প করে কাটিয়ে দেই।

—তই বই কি। কোথায় সারাদিনের খাটুনির পর মানুষ একটু বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঝরঝরে করে নেবে, তা না রাত জাগো. শরীর আরও খারাপ হোক! এরকম করতে করতে একটা শক্ত রোগ দাঁড়িয়ে যাক আর কী!

এরপর অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে নি বিশ্বনাথ। অপর্ণা ওর গলার কাছে তার নরম আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছিল, একসময় বলে উঠল,—ঐ যাঃ, খোকা উঠে পড়েছে। ছাড়ো, ছাড়ো,—ও কাঁদছে।

খোকা সত্যিই উঠেছে, অপর্ণা তাড়াতাড়ি কোলে টেনে নিয়ে বসল খোকাকে। মাস ছয়েকেরও হয় নি অথচ তার দুটি ক্ষুদ্র হাত-পায়ের বিক্রম দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়!

অপর্ণার শাড়ী বুকের কাছে দেখতে দেখতে অগোছালো হয়ে গেল, ক্ষুদ্র দস্যু ঝাঁপিয়ে পড়ল মাতৃবক্ষে অন্ধের মতো।

বাঁ-হাত দিয়ে অপর্ণা তাকে চেপে ধরেছে বুকের কাছে, ডান হাত তার শিশুর কোমরে, নিশ্চিন্ত আরামে সে পড়ে আছে মায়ের কোলে। আর অপরূপ ভঙ্গীতে অপর্ণা ঘাড়টা একটু কাৎ করে

সুনিবিড় মমতায় চেয়ে আছে শিশুর মুখের দিকে। আকাশে জ্বলছে তারার প্রদীপ, সুগন্ধি-সুরভিত দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে সারি সারি দীপ যেমন জ্বলে!

মুখ ফিরিয়ে সলজ্জ হাসিতে স্বামীর দিকে তাকালো অপর্ণা, বললে,—কী দেখছ চুরি করে, দুষ্টু?

বিশ্বনাথ বললে,—সে পুরাণো কথাটা আর না-ই বা শুনলে। সে কথা যুগে যুগে বহুলোকে চিত্রে-সাহিত্যে-স্থাপত্যে বারবার বলে গেছে।

খোকাকে একটু দোলা দেবার ভঙ্গীতে নাড়াতে লাগল অপর্ণা, বললে,—সাধে কি আর কেঁদে উঠল, খিদে পেয়েছিল বেচারীর! নয়ত, অনর্থক ও ত কখনো কাঁদে না, এদিক দিয়ে ও ভারী শান্ত। আর একটা কথা জানো? ও এতো লোক চেনে এ বয়সে! মার কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে যায় না! বাবা সেদিন এলেন ত কার্মাটাড় থেকে, ওমা, ছেলে কিছুতে যেতে চায় না!

অপর্ণা ঝুঁকে পড়ল ওর ওপর,—মাণিক আমার—সোনা—

একটু পরেই খোকা ঘুমোলো। অপর্ণা তাকে নামিয়ে রাখল তার বিছানাটার মধ্যে। তারপর বললে,—তুমিও শুয়ে পড়ো এবার, বরং শুয়ে শুয়েই গল্প করা যাক।

—তুমি শোও, আমার ভালো লাগছে না শুতে এখন।

অপর্ণা ততক্ষণ পাশ ফিরে শুয়েছে, অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে বলল,—বোঝা গেছে!

—কী?

—তুমি আমাকে আর তেমন ভালোবাসো না।

—বাসি অপর্ণা, প্রাণ দিয়েই বাসি। বারে বারে এই পুরাণো কথাটা কেন শুনতে চাও?

অপর্ণা বললে—খুশী। আমার কথা আমি একশোবার শুনব, তাতে কার কী এসে যায়?

বিশ্বনাথ অল্প একটু হাসে। তারপরে পরম স্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত ধরে সেই আদরটা উপভোগ করে অপর্ণা, তারপরে বলে,—কণাকে চিঠি দিয়েছি। কী লিখেছি জানো?

—কী?

ও বললে—আমার ছেলে আর একটু বড়ো হোক, আর ভগবান করুন তোর একটি মেয়ে হোক তখন,—তারপরে দুটিতে যখন বড়ো হয়ে উঠবে, তখন ওদের বিয়ে দেবো, বুঝলি?—ও কী লিখবে বলো ত? রাজী হবে?

বিশ্বনাথ হেসে ফেলল, বললে,—এমন লোভনীয় প্রস্তাব, রাজী না হয়ে পারে! তবে, সময় দিতে হবে, মেয়ে হোক আগে!

—দেখো, ঠিক মেয়ে হবে ওর।

কাকও ডাকল, সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে তালও পড়ল: লোকে বললে, কাক ডাকলেই তাল পড়ে। তেমনি, কণিকার আরও একটি ছেলে হলো, তারপরে সত্যিই ওর কোলে এলো মেয়ে। অপর্ণার সেই চিঠিটার কথা কণিকা ভোলে নি, পাঁচবছর আগেকার কথা, তবু স্পষ্ট মনে আছে তার। সে হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেই অপর্ণাকে চিঠি লিখলে—তোর ভবিষ্যৎবাণীই ঠিক হলো। এ মেয়ে তুই চেয়েছিলি, তোকেই দেবো বলে ঠিক করে রাখলাম মনে মনে। তখন দেখিস, আবার ভুলে যাস নি। এদিকে, মেয়ে এ বাড়ির চোখের মণি। শ্বশুর, বাপ চোখের আড়াল করতে পারে না মেয়েকে। বড়ো হয়ে তোর ঘরে যখন যাবে, তখন তুইও চোখের আড়াল করতে পারবি বলে মনে হয় না, মেয়ে আমার সুন্দরী হয়েছে। কী নাম রাখি বল ত? শ্বশুর আদর করে ডাকেন—চতুরিকা, নিপুণিকা। বাপ ডাকে—আদরিনী। একটিও আমার পছন্দ নয়, তুই একটি নাম বেছে দে না ভাই। তুই না পারিস,

আমার আর্টিষ্ট বেয়াইকে বলিস।

এরপর ঘন ঘন পত্রালাপ চলতে লাগল দুই সখীর মধ্যে। অপর্ণা লিখলে—তোর আর্টিষ্ট বেয়াই নাম রেখেছে,—শিখাময়ী। আমি রাখলাম—অরুণলেখা। কোনটা পছন্দ?

কণা লিখলে—আমার আর্টিষ্ট বেয়াইকে ধন্যবাদ জানাস আমার হয়ে; তাঁর নামটাই আমার পছন্দ হয়েছে। চমৎকার নাম,—শিখাময়ী। আমরা শিখা বলে ডাকবো। ভালো কথা, তোর বড়ো ছেলের নামটা কী রেখেছিস?

অপর্ণা জানালে—প্রদীপ। কী পছন্দ হয়?

কণার উত্তর—খুব।

জীবনের ধর্মই হচ্ছে—চলা। জীবন বসে থাকে না, ক্রমাগতই সে চলছে। আমরা চাই বা না চাই, জীবন নিজের গতিতে চলতেই থাকে। বনস্পতির শাখায় শাখায় পুরানো পাতা ঝরে পড়ে, নতুন পাতা এসে সেই স্থান পূরণ করে, এই ত নিয়ম।

কণা-অপর্ণাদের সংসারেও বহু দিন এলো, বহুদিন কেটে গেল—বহুদিন কেন, বহু বছর। বছরের পর বছর কেটে গেছে, এদের দুজনের সংসারেরও রূপ গেছে বদলে। অবসর পেয়েছে ওরা কম, তবু এরা গেছে বেড়াতে ওদের বাড়ি, ওরা এসেছে ওদের বাড়ি। হয়ত বছরে একবার, কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কী? বাকীটা ওরা, পূর্ণ করে নিয়েছে পত্রে।

প্রদীপ বড়ো হয়েছে, পাশ করেছে ভালো ভাবে। এবং ভালো ছাত্র বলেই ভালো কর্মক্ষেত্র পেতে তার অসুবিধা হয় নি। কণার সংসারে দুই দাদার সঙ্গে শিখাময়ীও বেড়ে উঠেছে।

তারপরে, প্রতিশ্রুতি মতো বিয়েও হয়ে গেল একদিন দুজনের। এই বিয়ে উপলক্ষ্যে দুই সখীর আবার দেখা হল পরস্পরের সঙ্গে।

অপর্ণাদের বাড়িতেই স্বামী পুত্র নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিল কণিকা। অপর্ণাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললে কণিকা—কী মোটা হয়েছিস রে!

—তুই আর বলিস না!

দুজন মনের আনন্দে হেসে ওঠে!

কণা বললে—তোর আর ছেলেপুলে হলো না কেন?

অপর্ণা বললে—না ভাই, ঐ শিবরাত্রির সলতেটুকু আছে, ওটিই বেচেবর্তে থাক। আশীর্বাদ কর তোরা!

—ওমা, করব না!—কণা বললে—আমাদের জামাই যে!

—মেয়েকে আই-এ পাশ করিয়েছিস, আমি কিন্তু বি-এ পড়াবো।

কণা হেসে উঠল, বললে--ও আর পড়বে না। শাশুড়ীর সমান সমান থাকতে চায় আর কী, শাশুড়ীকে ছাড়াতে চায় না।

—ওমা, ওকী কথা!

—সে ভাই তোমার বউ, তুমি বোঝা। আমাদের আর দায় কী?

কিছুক্ষণ ঠাট্টা-তামাসার পর কণা অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলে,—হ্যাঁরে, তোর সেই মিনুদির খবর কী? বিয়েতে তাকে বলিস নি?

চোখদুটো ছলোছল করে এলো কণার, বললে—কবে বলব? সে কি আর আছে ইহজগতে? মা হতে গিয়ে হাসপাতালে মরে গেছে বহুদিন। কেন, তোকে জানাই নি খবরটা?

—না।

—তাহলে ভুলে গেছি।

এরপরে, কেটে গেল আরও অনেকদিন, আরও অনেক বছর। বিশ্বনাথের মা চলে গেছেন, অপর্ণার বাবা চলে গেছেন। আর ওদিক কণার বাবা গেছেন, জ্যাঠামশাই ত গেছেন তার আগেই। আর গেছেন অনুপমের বাবা আর মা। সংসারের একদল গেছে একদল এসেছে।

প্রদীপের দুটি ছেলে দুটি মেয়ে। নাতি-নাতনী নিয়ে বেশ বড়ো সংসার আজ অপর্ণার। স্বাস্থ্যটাও তার আজ কাল ভালো যাচ্ছে না; ডাক্তার বলছেন চেঞ্জে যেতে। বিশ্বনাথ বললে—কার্মাটাড়েই চলো, আমাদের পুরাণো যায়গায়।

কণিকাকে অমনি চিঠি লিখতে বসল অপর্ণা,—কার্মাটাড়ে যাচ্ছি দাদা-বৌদির কাছে; দাদা ওখানে বাড়ি করেছে জানিস ত? তুই যাবি? চল না।

কণিকা লিখল—আমার জ্যেঠামশায়ের বাড়ি ত খালি পড়ে আছে। নিশ্চয়ই যাব। কবে রওনা হতে চাস? একসঙ্গেই রাওনা হওয়া যাবে।

কার্মাটাড়ের এক সকালবেলা।

বিছানায় শুয়ে থেকে এক সময় চোখ খুললেন বিশ্বনাথবাবু।

সকাল হয়ে গেছে নাকি? শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে কে ডাকছে তাঁকে? মেদস্ফীত দেহ, সমস্ত গালে-কপালে গভীর কুঞ্চন, মাথার চুল বেশীর ভাগই শাদা হয়ে গেছে, এ এক প্রায়-বৃদ্ধা মুর্তি।

মুর্তিটি ওঁকে ডাকতে লাগল, কণ্ঠস্বর রীতিমত কর্কশ, বুড়ো বয়সে ঘুম দেখ না! ডেকে ডেকে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভাঙানো যায়, কিন্তু ওকে ওঠাবে কার সাধ্য? ওঠো না? বাজারে যেতে হবে না? বিদেশ বিভূঁয়ে দেখে শুনে নিজে বাজার না আনলে চলে? ছাই আমার স্বাস্থ্য ভালো করতে আসা!

বিশ্বনাথবাবুর ইচ্ছা হলো একবার জিজ্ঞাসা করেন,—কে তুমি, তোমার নাম কী?

কিন্তু না, প্রশ্ন করবেন না তিনি, যদি উত্তর আসে,—আমার নাম অপর্ণা, তাহলে?

বেশ বেলা হয়ে গেছে ততক্ষণে। বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে দেয়ালের আয়নায় নিজের ছায়া পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

বিশ্বনাথবাবু,—অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন—এই কি আমি?

নিজেকে এমন করে বহুদিন দেখেন নি তিনি, দেখবার অবকাশও ঠিক আসেনি। মনে পড়ে গেল, কণিকাদেবীর জেঠামশাই, সেই বিজনবাবুকে। তিনি আজ ইহজগতে নেই, তবু তাঁর কথাগুলো কাণের কাছে যেন আজও বেজে ওঠে! মনে পড়ে যায় মহাকালের কাছে তাঁর সেই তীব্র আকুতি,—আমি আর কিছুই চাই না, আমার মাণিকের মাকে শুধু ফিরিয়ে দাও!

উঠে পড়েন বিশ্বনাথ। বারান্দার এক কোণে তাঁর বড়ো নাতনীটি দাঁড়িয়ে আছে গোলাপী রঙের একটা শাড়ী পরে। নাতনীর নাম রেখেছিলেন তিনিই। নাম রেখেছিলেন—সুতপা। সুতপা এখন পড়া নিয়ে ব্যস্ত, ওর পরীক্ষা সামনে। বি-এর পর বিয়েটাও হয়ে যাবে ওর, সব ঠিক-ঠাক হয়ে আছে। দিদি হয়েছেন স্বয়ম্বরা, এক জ্ঞান-তপস্বী তরুণ অধ্যাপককে বিয়ে করতে যাচ্ছে সুতপা। হয়ত, সকালে উঠে, মেঘলা-মেঘলা আকাশটার দিকে তাকিয়ে সে মানুষটির কথাই হয়ত ভাবছে সে।

ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারলেন না বিশ্বনাথবাবু। অপর নাতনীটি বোধহয় রান্নাঘরে তার মামীমা কিম্বা মামাতো বোনদের সঙ্গে গল্প করছে। এ নাতনীটিও তরুণী, আই-এ পড়ছে। নাতি দুটি আরও ছোট, স্কুলের ছাত্র। কিন্তু কোথায় তারা? মামাতো ভাইদের সঙ্গে মিশে বেড়াতে বেরিয়েছে বোধহয় দল বেঁধে!

ওঁরা উঠেছেন অনিমেষবাবুর বাড়িতে, কণিকাদেবীরা উঠেছেন বিজনবাবুদের সেই পরিত্যক্ত বাড়িটায়। বৌমা, বলা বাহুল্য, এখানেই উঠেছেন, বিকেলের দিকে শাশুড়ীর সঙ্গে হয়ত একটুক্ষণের জন্য বাপের বাড়িতে বেরিয়ে আসেন।

দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতার কোনো অভাব কোনোদিন ঘটেনি। দেখলে মনে হয়, দুটি পরিবারই সুখী সর্বতোভাবে।

কিন্তু, তবু? তবু একটা হাহা-করা হাওয়া বইতে থাকে অন্তরের

অন্তস্তলে! ঐ যে তাঁর ছোট নাতনীটি গান গায়,—

বিধুর বিকল হয়ে ক্ষ্যাপা পবনে
ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে।

কথা আর সুর যেন সুগোপনে শিল্পী সত্তাটিকে আমূল এসে নাড়া দিয়ে যায়!

অনুপমবাবুর মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না বাইরে থেকে। বহির্জগতে তিনি মোটামুটি কৃতী মানুষ, সময় পেলেই বই নিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ, আর কোনোদিকে খেয়াল নেই।

আর, বিশ্বনাথবাবু? সংসারে প্রতিনিয়তই কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি, কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন! কে সে? তাঁর সেই যৌবনদিনের—জীবনের মধ্যদিনের—অপর্ণাকে?

সংসারের টুকিটাকী জিনিষপত্রের সঙ্গে ছোটদের ভাঙাচোরা খেলনাগুলির দিকেও চোখ পড়ে বিশ্বনাথবাবুর।

কারখানার সেই পোড় খাওয়া দাশবাবুর মতোই তাঁর আজ-কাল এক এক সময় বলতে ইচ্ছা করে,—কাকে খুঁজছি! ও ওযে দোকান সাজিয়ে নিয়ে বসে গেছে! হ্যাঁ, এ ও এক রকমের বিপণি। ছোট বড়ো সংসারের বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন সেবা আর স্নেহের পসরা! এক ছিল, বহু অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে! সংসারে এটাই তো স্বাভাবিক!

অথবা সেই স্বাভাবিকতাকে বা মন সব সময় মানতে চায় কই? মন ত মহাকালের মানা সবসময় মানতে চায় না। নাতনীর গাওয়া সেই গানের বাণী মনে পড়ে। আমি যত বলি,—ওরে এবার যে যেতে হবে,—কিন্তু ভিতরের অবুঝ মন ভিতরের শিল্পী মন, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত হাহাকারে গুমরে ওঠে,—সংসারের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলে, না—না—না!